ডুবসাঁতার

মোশাররফ হোসেন খান

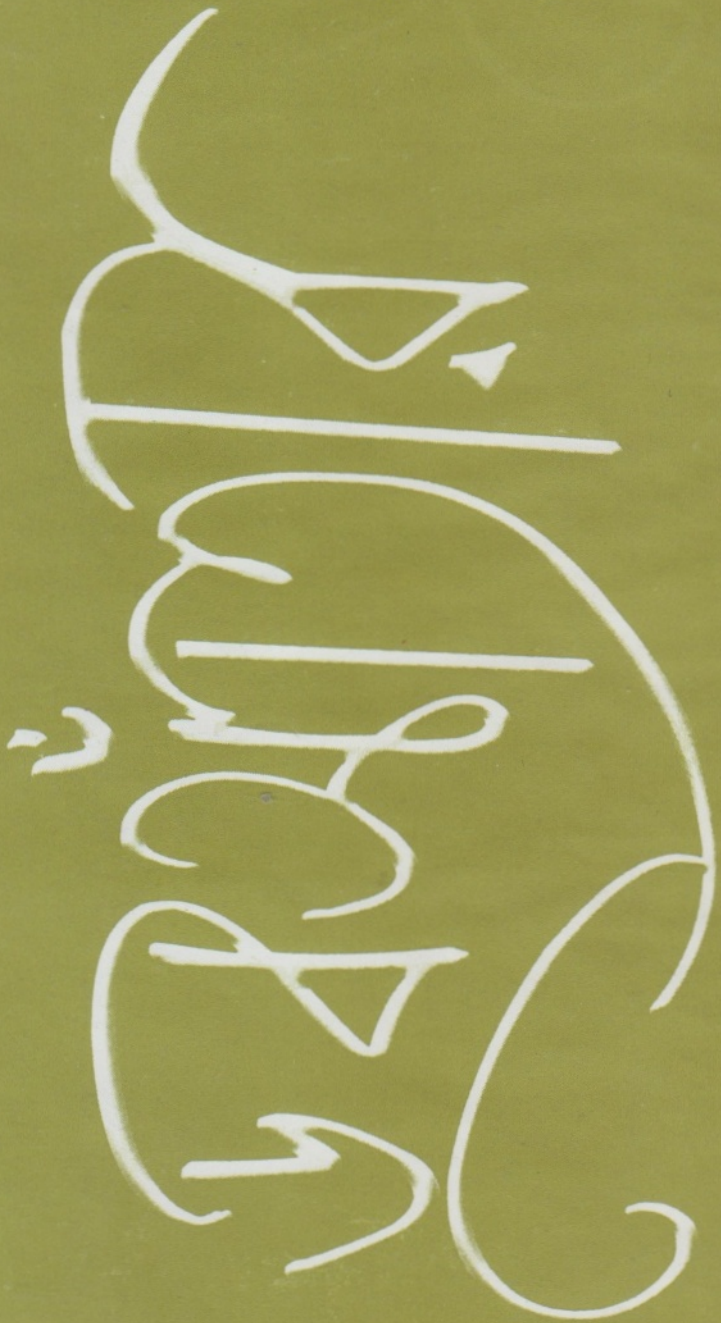

ডুবসাঁতার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ডুবসাঁতার

মোশাররফ হোসেন খান

সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা

www.pathagar.com

ডুবসাঁতার
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশনায়
সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
একুশ শতকের প্রথম বইমেলা
ফ্রেব্রুয়ারি ২০০১
গ্রন্থস্বত্ব
বেবী মোশাররফ
প্রচ্ছদ
শাইখ শাহবাজ
পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার [দোতলা]
ঢাকা ১১০০
দাম
পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

আব্বাজান
ও
আম্মাজান-কে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে
ক্রীতদাসের চোখ
নতুনের কবিতা
বৃষ্টিভেজা পংক্তিমালা
গন্তব্যের দিকে

গল্প

প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান
ডুবসাঁতার

কিশোর উপন্যাস

বিপ্লবের ঘোড়া
দরগা ডাঙার দাদুভাই

কিশোর গল্প

সাহসী মানুষের গল্প-১
সাহসী মানুষের গল্প-২
অবাক সেনাপতি
রহস্যের চাদর

জীবনী

হাজী শরীয়তুল্লাহ
সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর

সম্পাদনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে
মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

গল্পসূচি

দৌড় ৯
জাফরানি আলো ১৪
ঢাকাতংক ২০
টান ২৭
ফাটল ৩১
চতুর্দোলা ৩৫
কপোতাক্ষর কান্না ৩৯
মানুষ ৪২
অমানুষ ৪৫
মন-ময়ূরীর ডাক ৫০
ডুবসাঁতার ৫৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দৌড়

কামাল উদ্দীন অফিসে পৌঁছুতেই তার শরীরের ভেতর কেমন যেন শিরশির করে উঠলো।

পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে পিওনের চাকরি নিয়েছিল কামাল জীবনের প্রথম বয়সে। সেই শুরু।

কতোটা বছর চলে গেছে এর মধ্যে।

কতোটা সময় গড়ে গেছে কামালের জীবনের ওপর দিয়ে। এই অফিসেই। একই পদে।

এতো বছরের চাকরি জীবনে সে কতো মানুষকে দেখেছে। কতো বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সাথে দেখা হয়েছে। ভালো-মন্দ সবরকমের বসকেই সে দেখেছে। কাউকে দেখেছে নির্মম-নিষ্ঠুর, আবার কাউকে দেখেছে দয়ালু, সৎ ও ভালো মানুষ হিসেবে। আল্লাহর পৃথিবীতে হাজার রকমের মানুষ। হাজার রকমের স্বভাব তাদের।

এসব নিয়ে এখন আর সে ভাবছে না।

অফিসে প্রবেশ করে কামাল আজ দেখছে তার ব্যবহারের কেটলি, কাপ, চামচ এবং ছোট্ট বাক্সটিকে। তার দৃষ্টির সীমায় রয়েছে সেই পুরনো চেয়ার টেবিল, সেই দেয়াল, বসের আলমিরা এবং দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডার।

দেখতে দেখতে চোখদু'টো ঝাপসা হয়ে আসে কামালের। কমদামী মোটা লেন্সের চশমার ভেতর তার ক্রমাগত ঝরে পড়া গরম অশ্রুতে ভিজে ওঠে দু'চোয়াল। ক্যালেণ্ডারে হাত রেখে কামাল হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

কাল নতুন বছরের প্রথম দিন।

আজকের দিনটি ক্যালেণ্ডারের শেষ দিন।

আগামী কাল এই দেয়ালে নতুন ক্যালেণ্ডার উঠবে। নেমে যাবে পুরনো ক্যালেণ্ডার।

ক্যালেণ্ডারের মতোই কামালের জীবনটা। শুধু কামাল কেন, সকল মানুষের অবস্থা এমনি। আসা এবং যাওয়া। এটাইতো পৃথিবীর নিয়ম।

নিয়ম হলেও এটা মেনে নেওয়া বড়ো কষ্টের। বড়ো যন্ত্রণার। এই অভিজ্ঞতা যার নেই, সে কি করে বুঝবে আত্মযন্ত্রণার বিষের দাহ?

কামাল চোখ মুছে পেছনে ফিরতেই রহমত আলী বললো, 'কেমন আছো কামাল মিয়া?'

রহমত আলীর বয়স চল্লিশের ওপর। কামাল তার চেয়েও অন্তত পনের বছরের বড়ো। রহমত আলী পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে কেরানীর চাকরি করে। কেরানী হলেও তো কামালের ওপর।

কামালের বয়সের আর কেউ এই সেকশনে নেই। তবু তাকে সবাই 'তুমি' করে কথা বলে। তবু ভালো নামের শেষে একটা 'মিয়া' যোগ করেছে। হাজার হোক পিওন বলে কথা। তাদের আবার সম্মান কি? অফিসের অন্যদের ব্যবহারে কামালের মনে হয়েছে,

www.pathagar.com

পিওনরা কোনো মানুষের মধ্যেই পড়েনা। তাদের না আছে সুখ দ:খ, না আছে অনুভূতি, না আছে বোধশক্তি।

এসবে কামালের এখন আর কষ্ট লাগে না। দুর্ব্যবহার হজম করতে করতে অপমানের অনুভূতিটাও কেমন ভোতা হয়ে গেছে। রহমত অন্যদিন যেভাবে হুকুমের সুরে কথা বলে, আজকের স্বরটা অবশ্য তারচেয়ে অনেক কোমল।

রহমতের কথায় কামাল চোখ তুলে তাকালো। কামালের চোখদু'টো তখনো ভেজা ভেজা। রহমত সেটা বুঝতে পারলো। বললো, 'মনটা আজ খুব খারাপ বুঝি?'

'না স্যার, খারাপ হবে কেন? আর মনটা খারাপ করেই বা কি লাভ?'

'হ্যা তাই। একদিন তো আমাকেও এ অফিস থেকে চলে যেতে হবে। কেউ কি আর চিরকাল চাকরি করতে পারে?'

কামাল কাঁপাগলায় বললো, 'ঠিকই তো। আজ অফিস থেকে বিদায় নিতে হবে। তারপর একদিন তো চিরকালের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো।'

চেয়ারে বসতে বসতে রহমত বললো, 'এদিকে এসো কামাল মিয়া, তোমার সাথে একটু গল্প করি। আর সময় হবে কিনা কে জানে?'

রহমতের টেবিলের সামনে এসে কামাল দাঁড়ালো। রহমত চেয়ার দেখিয়ে বললো, 'বসো'।

কামাল বললো, 'না স্যার। এতোকাল যখন বসতে পারিনি, তখন আজ আর নাই বা বসলাম।'

'বসলে কোনো অসুবিধা নেই। তুমি বসো।'

কামাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'বসবো না স্যার। কি বলবেন, বলুন। আপনার জন্যে কি চা আনবো?'

রহমত যেন একটু ধাক্কা খেল। বললো, 'না। চায়ের দরকার নেই।'

'তবে?'

রহমতের চোখে মুখেও একধরনের বেদনা ও বিষণ্নতার ছাপ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রহমতের দিকে।

গতকাল সেকশনইনচার্জ করিম সাহেবকে রহমত বলেছিল, 'কামাল মিয়া তো আগামীকাল অবসর নিচ্ছে । আমাদের সেকশনে সে বহুকাল আছে। তার বিদায়ের সময়ে আমাদের কিছু করা উচিত।'

রহমানের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলো না করিম সাহেব। মানুষের জন্যে মানুষের এই সামান্য মানবতাবোধটুকুর আশা করেছিল রহমত। করিম সাহেবের কাছে কথাটি বলে রহমত যে ধাক্কাটি খেল, তা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অপমানটি যেন কামালের জন্যে নয়, তার নিজের জন্যেই এই অপমানের কাঁটা। বলতে গিয়েও কথাটি আর বললো না রহমত। ভাবলো, কামাল মিয়া তাহলে আরও বেশী কষ্ট পাবে। প্রসঙ্গ পালটিয়ে রহমত বললো, 'কামাল মিয়া, জানো তো কাল আমাদের বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়াউৎসব?'

'হ্যা জানি।'

'তুমি আসবে তো?'

www.pathagar.com

কামাল মাথা নিচু করে একটা দম ছাড়লো। একটু সময় নিয়ে বললো, 'আপনাদের খেলার মাঠে আমার যাবার কি কোনো দরকার আছে? তাছাড়া আজই তো আমার শেষ দিন।'

'শেষ দিন তাতে কি হয়েছে? কাল বছরের প্রথম। আমাদের ক্রীড়াউৎসবও কাল। আমি চাই তুমি আসবে। আমরা সকলে মিলেমিশে দিনটি আনন্দে কাটিয়ে দেব। কি আসবে তো?'

রহমত পরিবেশটাকে একটু হালকা করার জন্যে বললো, 'বুঝলে কামাল মিয়া, আমি ঠিক করেছি- কাল মাঠে একটি মানুষ একাকী দৌড়াবে এবং তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এ ব্যাপারে আমি আজ সবার সাথে আলাপ করবো। আশা করি আমার এ প্রস্তাবটা কেউ ফেলবে না। খেলাটি কেমন হবে বলোতো?'

কামাল বললো, 'আপনার এমন অদ্ভূত বুদ্ধিটা কেমন করে মাথায় এলো স্যার? কে দৌড়াবে মাঠে?'

রহমত বললো, 'দৌড়াবে তুমি।'

'আমি? এই বৃদ্ধ বয়সে একাকী মাঠে দৌড়াবো এটা কোনধরনের খেলা স্যার?'

রহমত বললো, 'এটা কোন ঠাট্টা নয় কামাল মিয়া। তুমি মনে কষ্ট নিওনা। এই খেলাটি এমন এক খেলা-যা মানুষকে তার নিজের দিকে ফিরিয়ে দেয়। একটা মাঠে মাত্র একটি মানুষ দৌড়াচ্ছে, ভাবোতো ব্যাপারটি কেমন? জানো, আমার আব্বাও ছিল তোমার মতো একজন পিওন। সে যেদিন অবসর নিয়েছিল, সেই দিনটিও ছিল বছরের শেষ দিন। আমার আব্বাকে দেখেছিলাম, একটি মাঠে সে একাকী দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময়. . .'

রহমতের দু'চোখ ছল ছল করে উঠলো। চোখ মুছে বললো, 'তারপরও আব্বা বেঁচে ছিল দশ বছর। আব্বার দৌড় কিন্তু থামেনি। তার মৃত্যুর আগ পর্যন্তও আমাদের জন্যে তাকে দৌড়াতে দেখেছি। বুঝলে কামাল মিয়া, একবার দৌড় শুরু করলে আর থামা যায় না। তুমিও থামতে পারবে না। না, ইচ্ছে করলেও পারবে না।'

রহমতের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো কামাল। ভাবলো, সত্যিইতো তার জীবনে কোনো ছুটি নেই। যে দৌড় সে পনের বছর থেকে শুরু করেছে, সে দৌড় এখনও আছে। আগামীতেও থাকবে। তা না হলে তিনটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে সে কিভাবে চলবে?

আজ বছরের শেষ দিন।

আজ কামালের চাকরিজীবনেরও শেষ দিন।

কোনো কাজে আজ তার মন বসছেনা। সে কেবলই ভাবছে, এই অফিস, আসবাবপত্র, এই সকল মানুষের মায়াকে ছিন্ন করে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। আগামীকাল সে এখানে আসলেও আজকের দিনটির মতো অন্তত নিজের মতো করে বসতে পারবে না। এসব ভাবতে ভাবতে কামালের হৃদয়ে একটি বেদনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে অফিস টাইম শেষ হতে চলেছে। যার যার মতো একে একে সবাই অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাহেব কয়েকবার কামালকে ডেকেছে। এটা ওটা চেয়েছে তার কাছে। বেলা দুটোর আগেই সে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কামাল যে চলে

www.pathagar.com

যাচ্ছে, একথা একবারও তার মনে পড়লোনা! কামালের মনমরা দেখেও করিম সাহেব বোধ হয় কিছু বুঝতে পারেনি। তাকে একবার অন্তত একটি সান্ত্বনার কথা বলতে পারতো। কিন্তু সে বললো না।

ব্যাপারটিতে কামাল খুব কষ্ট পেল। এতোকাল যেখানে চাকরি করলো, একটা জীবন যেখানে সে শেষ করে দিল, সেখানে এ ধরনের অমানবিক আচরণের আশা কামাল করেনি।

পীড়িত হলেও কামাল পিওন। তার দু:খ আর মর্মবেদনা বোঝার জন্যে কেবা আর থাকতে পারে?

কামাল ভারাক্রান্ত মনে জীবনের শেষ কাজগুলো করে যাচ্ছে। টেবিলের বিক্ষিপ্ত ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখছে। এবার তারও বিদায়ের পালা।

পেছন থেকে আবার রহমতের গলা শোনা গেল, 'কি কামাল মিয়া, কাজ কি শেষ হলো? কাজতো কখনো শেষ হবেনা। খামোখা দেরি করে লাভ কি বলো, চলো বেরিয়ে পড়ি।'

কামাল রহমতের দিকে তাকালো। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে যেন সকল ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। রহমত আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কি যাবে নাকি? চলো আজ এক সাথে যাই।'

কামাল কি ভেবে বললো, 'থাক স্যার। আপনি আপনার মতো যান। আমার মতো আমাকে যেতে দিন।'

রহমত একটা দম ছেড়ে বললো, 'বুঝলে কামাল মিয়া, যদি তুমি না হয়ে বড়ধরনের কোনো কর্মকর্তার আজ অবসর গ্রহণের দিন হতো, তাহলে দেখতে অফিসের চেহারাই আজ বদলে যেতো। কি যেতো না? একেই বলে ভাগ্য।'

রহমত একটু থেমে আবার বললো, 'করিম সাহেব বোধ হয় তোমাকে কিছুই বলেনি। লোকটা আস্ত চামার। আমি তাকে তোমার কথা আজও বললাম, দেখলাম তার মধ্যে কোনো মনুষত্ব নেই। ছোটলোক আর কাকে বলে! থাক সে কথা। তুমি আজ চলে যাচ্ছো, আমার মনটা খুব খারাপ। আমি গরীব মানুষ। তোমাকে তো তেমন কিছু দিতে পারবো না, এই নাও আমার সামান্য উপহার।' রহমত একটি ফুলের তোড়া আর একটি প্যাকেট এগিয়ে ধরলো কামালের দিকে।

কামাল রহমতের হাতে ধরা ফুল এবং প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল। তার দু'চোখ ছল ছল করে উঠলো। বললো, 'এগুলোর কোনো দরকার ছিলনা স্যার।'

রহমত হাসতে হাসতে বললো, 'নাও, ধর। এটা খুব সামান্য উপহার। আমার পক্ষ থেকে। আর শোনো, কাল তোমাকে যে খেলার মাঠে আসতে বলেছিলাম, তার আর দরকার নেই। এই বয়সে অতো ঝামেলা তোমার ভালো লাগবে না।'

কামালকে আসতে নিষেধ করার ব্যাপারটি বলতে গিয়েও আর খুলে বলতে পারলো না রহমত। বললে কামাল আরও বেশি কষ্ট পাবে। মানুষ সম্পর্কে তাহলে তার ধারণা আরও খারাপ হয়ে যাবে। কি দরকার, এই দু:সময়ে লোকটির মন ভেঙ্গে দেবার।

কামাল রহমতের হাত থেকে ফুলের তোড়া এবং প্যাকেটটি নিয়ে রাস্তায় নামলো।

তার জীবনের শেষ অফিস করা।

www.pathagar.com

কাল থেকে সকাল হলেই আর উর্ধশ্বাসে অফিসের জন্যে ছুটতে হবে না। বাদুড়ঝোলা হয়ে আর বাসে চড়তে হবে না। কাল থেকে তার ছুটি।

ব্যস্ত রাজপথের ফুটপাথ ধরে হাঁটছে কামাল। হাঁটছে আর ভাবছে 'সত্যিই কি আমি অবসর নিতে পেরেছি? সত্যিই কি আমি ছুটি পাচ্ছি?'

পরক্ষণেই সে আবার মনে মনে বলে, 'কিসের ছুটি? কাল সকালেই তো আবার আমাকে ছুটতে হবে রুটি-রুজির সন্ধানে। ছেলে-মেয়েগুলো ছোট। তাদেরকে মানুষ করতে হলে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাকে ছুটতে হবে। দৌড়ুতে হবে। রহমত তো ঠিকই বলেছে, দৌড় একবার শুরু করলে আর থামা যায় না। এ দৌড় বড় কষ্টের দৌড়। এ দৌড় খুব সাংঘাতিক— বিপজ্জনক দৌড়।'

হাঁটতে হাঁটতে কতোদূর হেঁটেছে কামালের তা খেয়াল নেই। আজ যেন তার বাসায় ফেরারও কোনো তাড়া নেই। কেবলই হাঁটছে।

আকাশটা মেঘে ছেয়ে গেছে।

চারদিকে ঘনঘোর অন্ধকার। হয়তোবা এখুনি ঝড়বৃষ্টি নেমে আসবে। রাস্তার লোকজন আর গাড়িগুলো শাঁ শাঁ গতিতে যার যার গন্তব্যের দিকে চলে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে।

সবাই খুব ব্যস্ত।

সবাই যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল। মুঠো মুঠো ধুলোবালি উড়ে এসে ভরে গেল কামালের দুচোখ। সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা। চোখের ধুলোবালি পরিষ্কার করতে গিয়ে তার হাত থেকে অকস্মাৎ ছিটকে পড়ে গেল রহমতের দেয়া ফুল আর প্যাকেটটি।

ও দু'টোকে তুলবার আর ইচ্ছা হলো না কামালের। তার রোগাটে দুর্বল শরীরটা টলছে। তবুও প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে যন্ত্রণাকাতর চোখদুটো এঁটে ধরে সর্বশক্তি দিয়ে উর্ধশ্বাসে সামনে দৌড় দিল কামাল।

ক্রমাগত সামনে। ■

www.pathagar.com

জাফরানি আলো

অন্ধকারটা চারদিক থেকে কেমন ধেই ধেই করে ছুটে আসছে। চারপাশে তেমন কোনো শব্দ নেই। গোরস্তানের মতো একটা থমথমে পরিবেশ।

দয়ালু জোছনা গত সপ্তাহে বিদায় নিয়েছে।

লোডশেডিং তো এ শহরের জন্যে প্রতিদিনকার একমাত্র ভূষণ। ঠিক যেমন অনাহারক্লিষ্ট ভাসমান ভিক্ষুক এশহরের অন্যতম অলংকার, তেমনি ভাসমান পতিতার মতো, কিংবা চাঁদাবাজ মাস্তানের মতো হরতালও এশহরের এক অনিবার্য অহংকার।

আজও হরতাল ছিল।

আজও রাস্তায় বার হয়নি কোনো যানবাহন।

তবুও পেট বলে কথা। ক্ষুধার আগুন সর্বগ্রাসী। সে মানে না বাধা। জানে না ভয়।

গত দুদিনও হরতাল ছিল।

রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল। দোকান পাট ভয়ে খোলেনি কেউ। শহর ছিল শীতের ভোরের মতো ঘুমিয়ে। নিস্তব্ধ নীরব।

বিত্তবান লোকেরা এ তিনদিন অঢেল ক্লান্তির ঘাম মুছে একটু স্বস্তির হাই তুলে সুখনিদ্রায় অলস সময় কাটাচ্ছে।

যারা হরতাল ডেকেছে, তাদেরও পেটের সমস্যা নেই। তাদের নাকি বানের স্রোতের মতো অর্থ আসে গোপন গহ্বর থেকে।

এই হরতালে কার কি লাভ হলো?

না, সেসব ভেবে কোনো কাজ নেই। ওসব বড় বড় মানুষের ব্যাপার স্যাপার।

সেলিম কেবল বোঝে, ক্ষুধার আগুন বড় আগুন। এ আগুনের অর্থ বোঝে একমাত্র ভুক্তভোগীরাই।

সেলিমও চেয়েছিল, হরতালের দিনগুলোতে একটু আরাম করতে। অনেকদিন পর শরীরের একটু বিশ্রাম দিতে। কিন্তু তা আর হলোনা। বিকাল না হতেই তার স্ত্রী— মাসুদা বললো,

আজ কিন্তু ঘরে আর কিছুই নেই। কোনোরকমে গতকাল চলেছে, আর চলবে না। বাচ্চার দুধও শেষ।

মাসুদার কথার মধ্যেও কেমন যেন হরতালের মতো একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আছে।

সেলিম কিছুক্ষণ তবুও নিশ্চুপ। সে জানে, অভাবের সংসারে সব কথার জবাব দিতে গেলে যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে সড়ক দুর্ঘটনার মতো মারাত্মক কিছু। সে কেবল, এমন সংকটের সময়ে নীরবতাকেই বেছে নেয়। আর তখন চারপাশের হাজার

www.pathagar.com

রকমের গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করে। কোন্ কথার মধ্যে কোন্ গন্ধ, এতদিনে তা সে বেশ করে বুঝতে শিখেছে।

যেমন, সেদিন অফিস থেকে বাসায় আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। একাকী হেঁটে হেঁটে সে বাসায় ফিরছে। কাকরাইলের মোড়ে আসার পর তারার মতো একটি ঝলমলে মেয়ে বললো, আপনি কি খিলগাঁও যাবেন?

মেয়েটি কিভাবে জানলো সেলিম খিলগাঁও যাবে?

মেয়েটির ঠোঁটের কোণে তখনও একবিন্দু অনেক চেনা হাসির ঝলক জেগে ছিল।

সেলিম তার দিকে এক পলক তাকিয়েই সাপ দেখার মতো ভয়ে দশ হাত পিছিয়ে গেল।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

মেয়েটির হাসির মধ্যে একধরনের হিংস্রতার গন্ধ ছিল।

মাসুদার কণ্ঠে অবশ্য অসহায়ত্বের গন্ধটা আজ অনেক তীব্র। তার কণ্ঠে মরা নদীর স্রোতের মতো করুণ ধ্বনি।

তিনদিনের হরতাল।

হাতে কোনো টাকা নেই।

অর্থশূন্যতাও একটা ব্যাধি। এ ব্যাধিতে যে আক্রান্ত, তার কোনো রাত দিন থাকেনা। ভয় থাকে না। ঈদ কিংবা কোনো পার্বন থাকেনা। হৃদয়ের ভেতর যুদ্ধের অবিরাম ধ্বংসধ্বনিতে সে ভুলে যায় বাইরের যুদ্ধের কথা। ভেতরের রক্তক্ষরণে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাকে বহুদূর। সীমাহীন সীমানায়। তখন সে আর দেখতে পায়না বাইরের রক্তপ্রবাহ।

অভাব, দারিদ্র আর অশেষ দু:খ কষ্ট ভুলিয়ে দেয় জীবনের সবুজ স্বপ্নকে। ভুলিয়ে দেয় হলুদ প্রহর।

সেলিমও যেমন ভুলতে বসেছে, তারও একদিন স্বপ্ন ছিল। তারও একদিন কিছুটা অবসর ছিল, যেদনি সে স্বর্ণের মুদ্রার মতো স্বপ্ন নিয়ে খেলা করতো অষ্টপ্রহর। ছাত্ররাজনীতি করতে গিয়ে তারও একদা মনে হয়েছিল, জীবনটা এমনই। চারদিক কেবল ধবধবে জোছনার মতো সোনালী স্বপ্ন। হাত বাড়ালেই মুঠো মুঠো মুদ্রা আর সুখকর মাংসপিণ্ড।

তারপর যা খুশি তাই করা।

তারপর রাতভর খেলা আর খেলা।

সেলিম ইচ্ছে করলে পারতো এমনি একটা জীবন গড়ে নিতে। কিন্তু না, তা সে পারেনি। রাজনীতির ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সে কিছু সুবিধাও আদায় করতে চায়নি।

আর চায়নি বলেই সেলিম আজ ব্যর্থ। অন্তত তার বন্ধুদের চোখে। যারা এখনো ওপর তলায় যাবার সময় গাড়ির ফাঁক দিয়ে করুণার দৃষ্টিতে তাকায় সেলিমের দিকে আর আফসোস করে, হায় বোকা হাদারাম! তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

তাকে দিয়ে যে কিছু হবে না, একথা সেলিমের চেয়ে আর কে বেশি জানে?

হবার হলে তো কবেই হয়ে যেত।

পিতার অসুখের চিকিৎসা হতো।

বোনের ভালপাত্রে বিয়ে হতো।

এই শহরে সে ভালভাবে থাকতে পারতো।

www.pathagar.com

ভাল একটা ঘরে বিয়ে করে কত কিছুইনা করতে পারতো।

আসলেই বোকা সেলিম। তা না হলে রাজনীতিতে কেন তার পাহারাবে।

কেন এই সামান্য বেতনে প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতে হবে।

তা না হলে আজ কেন তাকে অর্থের জন্যে কাটা কবুতরের মতো বুক তড়পাতে হবে?

মাসুদা এবার গলার স্বর আর একটু উঁচু করে বললো, এখনও বসে আছো যে, একটা কিছুতো করতে হবে। বেলা যাচ্ছে না!

সেলিম এবারও কোনো কথা বললো না। মৃত মাছের মতো তার চোখের দৃষ্টি কেবল স্থির হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর এবং মন কোনোটাই আর নড়তে চাইছে না।

কোনো কথা না বলে সে জামা কাপড় পরে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে একবার ভাবলো, একে তো প্রায় অচল মানুষ। একটা পা নকল। সে পায়ে কোনো ভর রাখা যায় না। গাড়িও বন্ধ। দু'একটা রিক্সা যদিওবা চলছে, তবু খুব ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে ভাড়াও দ্বিগুণ। এসময়ে কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়!

কোথায় যাবে সে, তা একরকম ঠিক করাই ছিল।

ইচ্ছে করলে এখন সে তার সহপাঠী মন্ত্রীর কাছে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে কালো টাকার পর্বত নামে খ্যাত তার বাল্যবন্ধু রহমতের কাছে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে সে তার সহপাঠী সুবিধাভোগী রাজনৈতিক লিডার আরিফের কাছেও যেতে পারে। সে জানে তারা কেউনা কেউ সেলিমের এই দুর্দশার পাথর সরিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু না, সেলিম সেদিকে যাবে না। যায়নি কোনোদিন। সে যাচ্ছে অন্যখানে।

পকেটের ভাঁজকরা পেপার কাটিংটা সেলিম বার করলো। ঠিকানাটা আর একবার দেখে নিল। লোকেশনটা বুঝবার চেষ্টা করলো।

ভাবলো, তবুও ভালো। এখান থেকে বেশি দূরে হবে না। একটু কষ্ট করে আধা ঘন্টা হাঁটলেই সেখানে পৌছানো যাবে।

একটা সাহস আর আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে সেলিম সামনে হাঁটা শুরু করলো।

শেষ ঘিকেল।

এক পায়ে ভর রেখে আর নকল পা-টা টানতে টানতে সেলিম হাঁটছে। তার খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। তবুও অভাবের এক কালোদৈত্য তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

কিছুদূর যাবার পর সেলিম দেখলো একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি কেবলই ওপরে উঠে যাচ্ছে।

তার চারপাশ থেকে লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। একটা আকাশবিদারী শব্দে চারপাশ তখনো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সেলিমের নাকের ভেতর প্রবেশ করলো অতি পরিচিত সেই পোড়ো গন্ধটি। এই গন্ধটির কথা সে সারা জীবনের জন্যে ভুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভুলতে চাইলেও সেলিম তা আর পারলো না। একসময় এই পোড়ো গন্ধটির ভেতর সেলিম এক ধরনের মাদকতা অনুভব করতো। আজ, এখন তার সেই পরিচিত গন্ধে যেন বমি উথলে উঠছে।

সবাই পালাচ্ছে। সবাই দৌড়াচ্ছে।

কিন্তু সেলিম পালালো না। সে দৌড়াতে পারে না। সে আর কখনো দৌড়াবেও না। না

www.pathagar.com

স্বপ্নের জন্যে। না জীবনের জন্যে। সে কেমন অনায়াসে রাস্তার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। যেন এই মুহূর্তে কোথাও কিছু ঘটেনি।

হইচই থেমে গেলে সেলিম দেখলো, একটি রক্তাক্ত ঝলসানো বীভৎস লাশের চারপাশ ঘিরে ধরেছে অনেক মানুষ।

এটা যেহেতু একটি সাধারণ মানুষের লাশ, সুতরাং তার কোনো বিশেষ পরিচয় থাকবে না। সেলিম জানে। সেলিম জানে, আগামীকাল এই লাশকে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরো দানা বেধে উঠবে।

অন্তত কয়েকটি রাজনৈতিক দল দাবী করবে, লাশটি আমাদের। লাশের তখন একটি নাম হবে। যে কোনো একটি দলের সে কর্মী হয়ে যাবে। যারা লাশের দাবী করবে, তারাও জানবে না লাশটির আসল নাম, তার প্রকৃত পরিচয়। এমনও হতে পারে, আন্দোলনের প্রয়োজনে তাদের দরকার ছিল একটি লাশের। তারা লাশ বানিয়েছে। এখন আন্দোলন তুঙ্গে উঠবে।

সেলিম জানে, রাজনীতির এমনই ধারা। এদেশের জনগণকে রাজনীতিকরা টয়লেটপেপার মনে করে। প্রয়োজনে ব্যবহার করে। প্রয়োজন ফুরালে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সে যাই হোক। সেলিমের ওদিকে এখন আর কোনো আগ্রহ নেই। সে যাচ্ছে এখন অন্য দিকে। তার চোখে এখন অনাহারক্লিষ্ট একটি পরিবারের বিধ্বস্ত ছবি।

জটলা পার হয়ে তার গন্তব্যে যেতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ঠিকানার সাথে মিলিয়ে সেলিম বাসাটির সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। হাঁফ ছেড়ে একটু বিশ্রাম নিলো। তারপর গেটের সামনে গিয়ে ভাবলো, কার কাছে জিজ্ঞেস করা যায়?

এমন সময় একজন গেট খুলে বাইরে যাবার জন্যে বার হলো। সেলিম বললো, এটাইতো নঈম সাহেবের বাসা?

হ্যা। কেন? কোথা থেকে আসছেন?

তার কাছে আমার একটু প্রয়োজন ছিল। তিনি কি বাসায় আছেন?

আছেন। আপনি আমার সাথে আসুন। উনি আমার বাবা।

নকল পা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে সেলিমের খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও সে নিরুপায়। তাকে প্রতিটি সিঁড়ির সাথে সংগ্রাম করে করে ওপরে উঠতে হচ্ছে।

দোতলায় বসার ঘর দেখিয়ে দিয়ে লোকটি ভেতরে চলে গেল।

বাড়িটি পাঁচতলা। বেশ জায়গা নিয়ে বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে। বাড়ির চারপাশে অনেক খালি জায়গা। অনেক গাছগাছালি এবং ছোট্ট একটি ফুলের বাগানও আছে।

সেলিম বসে আছে। তার সারা শরীরে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার ছাপ। আষাঢ়ে মেঘের মতো তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। সে ভাবছে অনেক কিছুই ভাবছে, রাজনীতিতে বুদ্ধির সাথে চাল খেলতে পারলে আজকে সেও হয়তোবা এমন একটি বাড়ির মালিক হতে পারতো। হতে পারতো আরও অনেক কিছু। কিন্তু হলো না কিছুই।

ভাবনার মধ্যেই সে চলে গেল বহুদূর। এতদূর যে, সেখান থেকে সেলিম আর ফিরে আসার ইচ্ছেও হারিয়ে ফেলছে ক্রমান্বয়ে। একটা ধূসর অন্ধকারের দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে

www.pathagar.com

এখন কিছুক্ষণ অন্তত বিশ্রাম নিতে চায়।

কিন্তু তা আর হলো না।

তার সামনে ধবধবে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরা ক্লিনসেভের এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। সেলিম তাকে সালাম জানালো।

তিনি উত্তর দিলেন এমন ভাবে, যাতে করে সেলিম আর একটি পরিচিত গন্ধের সন্ধান পেল।

তিনিই নঈম সাহেব।

জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রয়োজনে?

সেলিম বললো, গতকাল পেপারে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। আপনার একটি কিডনীর প্রয়োজন। আমার রক্তের গ্রুপের সাথে আপনার প্রার্থিত রক্তের গ্রুপও ঠিক আছে। যদি চান তাহলে আমি আপনাকে একটি কিডনী দিতে পারি।

নঈম সাহেব খুব খুশি হলেন। বোঝা গেল, তার বুক থেকে একটি ভারি পাথর যেন নেমে যাচ্ছে। তিনি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই একটি কিডনীর প্রয়োজন। তবে আমার নয়। আমার মেয়ের জন্যে। তা আপনাকে এর জন্যে কত দিতে হবে?

টাকার খুব প্রয়োজন সেলিমের। তবুও কিডনীর মত বিষয় নিয়ে দরদাম করতে তার বিবেক এবং রুচিতে বাধলো। বললো, সেটা আপনিই বিবেচনা করবেন। আমার পক্ষে দাম চাওয়া সম্ভব নয়।

নঈম সাহেব একটু থেমে বললেন, কিডনী না পেলে আমার মেয়েটি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাবে। আর ওটা পেলে সে হয়তোবা বেঁচে যাবে। জীবন-মরণের ব্যাপারে তো কোনো দরদাম চলে না। তবুও, আপনি আমার মেয়ের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছেন, তার জন্যে আমার তো একটা কিছু করতে হবে।

সেলিম বললো, সেটা আপনার বিবেচনা। তবে এই মুহূর্তে আমার টাকার খুব প্রয়োজন। আপনারা কবে, কখন, কিভাবে কিডনীটা নেবেন আমাকে জানালে ভাল হয়।

নঈম সাহেব বললেন, আপনি একটু বসুন। আমি ভেতর থেকে আসছি।

সেলিম বসে আছে।

একটু পরেই বেরিয়ে এলেন নঈম সাহেব। তার হাতে একটি খাম। খামটি সেলিমের হাতে দিয়ে বললেন, এটা নিন। এতে সামান্য কিছু টাকা আছে। পরে আরও দেখা যাবে।

খামটি হাতে নিয়ে সেলিম বুঝলো, বেশ ভারি। তার শরীরে ঘাম বয়ে যাচ্ছে।

এমন সময়ে প্রবেশ করলো একটি মেয়ে। বয়স পঁচিশের মধ্যে হবে।

মেয়েটি প্রবেশ করতেই নঈম সাহেব বললেন, এই আমার মেয়ে, রুবিনা। এর জন্যেই কিডনীর প্রয়োজন।

রুবিনা!

কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রুবিনার শরীর। তার সারা শরীরে মৃত্যুর কালো ছায়া।

সেলিম চমকে উঠলো।

একপলকে দেখে নিল মেয়েটিকে।

www.pathagar.com

রুবিনার সাথে দিনারও যেন কোথায় একটা মিল আছে।

দিনা! সেই দিনা, যে পড়তো তার সাথে। যার রক্ত গড়ানো উরু দেখে একবার বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিল সেলিম। তারপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সেলিম এই শহর চষে বেড়িয়ে ছিল। কিন্তু, আফসোস! লিটনকে সেদিন কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই দিনা, কিডনীতে ভুগে এক সময় যে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে পরাজিত হয়েছিল। সেই দিনা, যে বেঁচে থাকলে হয়তোবা সেলিমের জীবনের অর্থটাই বদলে যেত।

রুবিনা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেলিম রুবিনার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে দেখছে, যেন রুবিনা নয়, দিনা। যার উরু বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যে ভীষণ ক্লান্ত। যে অপমানে আত্ম হত্যার জন্যে পথ খুঁজছে। যে আবার এক সময় বাঁচার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

সেলিম রুবিনার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, আমি এখন তাহলে আসি। আমার ঠিকানা দিচ্ছি। আপনার প্রয়োজন হলেই জানাবেন, আমি আসবো এবং কিডনী দেব। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো সেলিম।

নঈম সাহেব বললেন, আরে, খামটি তো ভুলে রেখে যাচ্ছেন!

সেলিম বললো, ভুলে নয়। আমি জেনে বুঝেই রেখে যাচ্ছি। ওটার আমার আর প্রয়োজন নেই। কথা দিচ্ছি, আমি রুবিনার জন্যে কিডনী দেব। তার জন্যে কোনো বদলা আমি নেব না।

রুবিনা বললো, কেন?

সেলিম একথার কোনো জবাব দিতে পারলো না। শুধু বললো, আমার একটি পা নেই। তবুও আমি বেঁচে আছি। আবার একটা কিডনী না থাকলেও আমি বেঁচে থাকবো।

কিন্তু, টাকা নেবেন না কেন? রুবিনার চোখে অপার বিস্ময়।

সব প্রশ্নের কি সঠিক জবাব দেয়া যায়? অন্তত আমি তো তা পারিনে,বলে সেলিম ঘুরে দাঁড়ালো।

রুবিনা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলিমের দিকে। ভাবলো, পৃথিবীতে কত বিচিত্র ধরনের মানুষই না আছে। কতজনকেই বা আমরা আর চিনি?

একটা প্রশান্ত বাতাস যেন বহুদিন পর বড় বাড়িটিতে প্রবেশ করলো। বহুদিন পর।

সেলিমও কষ্টের অনন্তসমুদ্র থেকে এইমাত্র তীরে উঠে যেন প্রাণভরে মুঠো মুঠো মুক্ত শীতল বাতাস টেনে নিল।

বহুদিন পর আজ, এই ঘনকালো অন্ধকারে, নির্জন রাজপথে দাঁড়িয়ে তার প্রাণখুলে হাসতে ইচ্ছে করছে।

সেলিম একটি লাইটপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আর তখন, ঠিক তখনি বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো প্রবীণ শহর। এবং তার চারপাশ ভরে উঠলো এক স্বর্গীয় মাতাল করা গন্ধে। ■

www.pathagar.com

ঢাকাতংক

অফিস থেকে বেরুবার পরই মফিজের মনে হলো কেউ যেন তার পিছু নিয়েছে।

একবার ভাবলো ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই

ঘাড় ফেরাবার চিন্তাটা মাথায় আসতেই তার বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো। সে অনুভব করলো অনুসরণকারী যেন কাছে, আরও কাছে একেবারে তার ঘাড় বরাবর চলে এসে। এবং তারপর—

তারপর একটা ভারী হাত, ঠিক পাথরের মতো, পাথরও নয়। যেন অন্যরকম, ধারালো নখবিশিষ্ট বীভৎস একটি থাবা তার ঘাড়ের রগকে স্পর্শ করছে।

শিউরে উঠলো মফিজ।

অফিস থেকে বেরুবার সময় তার খুব পেচ্ছাবের বেগ হয়েছিল। টয়লেটে যাবার জন্যে কয়েকবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারেনি। অফিস ছুটির সময়ে টয়লেটে ভিড় জমে ওঠে। ঠিক যেমন অফিসে আসার সময় বাসস্ট্যণ্ডে ভিড় থাকে।

অফিস থেকে বেরুবার সময় সবাই একটু হালকা পাতলা হয়ে বেরুতে চায়। তাতে করে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে। ক্লান্তিটা অনেক কম মনে হয়।

কিন্তু কপাল আর কাকে বলে! টয়লেটে ঢুকবার সুযোগ না পেয়ে মফিজ সেই তলপেট ভারী অবস্থায় রাস্তায় নামলো। নামার সময় তার শরীরের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু যখন অনুভব করলো তার ঘাড়ের রগ কেউ স্পর্শ করেছে, সাথে সাথে সে ভুলে গেল পেচ্ছাবের কথা। ভুলে গেল তলপেটের ভারী এবং টনটনে ব্যথার কথা। সারা শরীর ঘেমে উঠলো।

ভয়ের চোটে মানুষ নাকি পায়খানার বেগও ভুলে যায়। মফিজের এখনকার অবস্থা ঠিক তেমনি।

এই ভয় ভয় এবং আতংকটা মফিজের বুকের ভেতর বাসা বেঁধেছে বেশ কিছুদিন ধরে।

বেশ কিছুদিনও নয়। বলতে গেলে মাত্র সপ্তাহখানেক। এর আগেও অবশ্য এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল করেনি মফিজ।

সেদিন শুক্রবার।

সাত সকালে পেপার হাতে নিতেই একটি বীভৎস ছবি দেখে সেই প্রথম আতকে উঠলো মফিজ। ঢাকার বুকের ওপর একটি যুবককে দিনে দুপুরে তার প্রতিপক্ষরা টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করেছে।

কি ভয়ংকর সেই ছবি!

শত শত মানুষের সামনে কসাইরাও আজকাল আর গরু-ছাগল জবাই করে এমনভাবে কাটে না। যা করার তা সূর্যোদয়ের আগেই সেরে নেয়।

কিন্তু মানুষ! মানুষ কি পাষণ্ড! শত শত মানুষের সামনে তারা কিভাবে আর একটি

www.pathagar.com

মানুষকে কসাইয়ের মতো শৈল্পিকভাবে কাটতে পারে!

ভাবতেই শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠলো মফিজের। টপ করে পড়ে গেল হাতের পেপার।

কোনো জন্তু জানোয়ারও এমনটি করতে পারেনা। পারেনা তারা তাদের স্বজাতিকে এমন নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে। করেও না। বরং বিড়ালের বাচ্চাকে খেকি কুত্তা তার দুধ খাইয়ে আদর যত্নে পরম মাতৃস্নেহে লালন পালন করার ঘটনাও বিরল নয়।

এখন খারাপ মানুষের সাথে পশুর তুলনা করা আর চলতে পারেনা। বরং সেটা খুবই বেমানান।

মফিজের ভেতর ভয় এবং আতংকের সূত্রপাত সেখান থেকেই।

তারপর একে একে এই আতংকের বীজটিতে চারা গজালো। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে বড় হতে হতে এখন সেটি মহীরূহে রূপ নিয়েছে।

সেইদিন সকালে মফিজ রিকসায় যাচ্ছে মগবাজার। চালক এমনভাবে চালাচ্ছে যেন তার যমে টানছে। মফিজ এতো করে তাকে বললো আস্তে চালাতে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ব্যস। যা হবার তাই হলো। মালিবাগ বিপনী বিতানের কাছে যাবার সাথে সাথে ঘ্যাচ করে আর একটি রিকসার গায়ে ভীষণ জোরে ধাক্কা খেল তার রিকসাটি। মফিজ ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। সামনে গাড়ি চলছে। তবু ভাগ্য ভালো, অপঘাতে তার জীবন যায়নি সেদিন। কিন্তু মুচকে গেল তার বাম পা। ভীষণ যন্ত্রণা। যন্ত্রণাকাতর পা টেনে যখন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন দেখলো, রিকসাচালক কোমর থেকে ছুরি বার করে তার প্রতিপক্ষের প্রায় বুকে ঠেকিয়ে খিস্তিখেউড় করছে অশ্লীল ভাষায়। আশপাশের দর্শকের ভিড় জমে উঠেছে। তাদের ভাবটা এমন— লেগে যা তোরা। তারপর দেখিব খেলাতে কে হারে কে জেতে?

রিকসা চালকের হাতে চকচকে ছুরি!

মফিজের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। সে যেন তার চোখকেও আর বিশ্বাস করতে পারছেনা। এখানে অপেক্ষা করা আর নিরাপদ নয় ভেবে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

একেই বলে ঢাকা শহর। কবি ঠিকই লিখেছিলেন ঃ 'সন্তাপ দহনে জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু নগর/ পাপের ছেনিতে কাটে বিষাক্ত জীবন, রক্তের নদীতে ভাসে স্বপ্নের ফানুস/ ত্রাসের নগর যেন ক্ষুধার্ত কুকুর— পাপিষ্ঠ নগর থেকে পালাও মানব/...নিরন্ন নগর যেন কুষ্টের বাহন। পালাও নগর থেকে পালাও মানব।'

ঢাকা শহর মানেই প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর সাথে হাত ধরাধরি করে প্রহর কাটানো। পায়ে পায়ে বিপদ আর মৃত্যুর হাতছানি। তারা কেবলই পেত্নীর মতো ডাকে-আয় আয়। ভয়ংকর মুহূর্তগুলো ডাকে- এসো এসো আমার ঘরে এসো।....

সন্ধ্যায় পায়ের ব্যথাটা আরও বেড়ে গেল। মালিশে কাজ হচ্ছেনা। পারভীন বললো, তুমি জানো যে এটা মালিশের কাজ নয়, ওষুধের প্রয়োজন। তবুও তুমি ডাক্তারের কাছে যাবে না। যত্তোসব!

www.pathagar.com

মফিজ করুণ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো— বিশ্বাস করো, রাস্তায় নামতে আমার খুব ভয় করছে। আজকাল রিকসাওয়ালারাও ছুরি চাকু নিয়ে ঘোরে। জানিনা তাদের কাছে পিস্তল— টিস্তলও থাকে কি না। তাছাড়া ঢাকা শহরে গাড়ি আর রিকসার দাপটে পথে চলাই মুশকিল। জানটা হাতে নিয়ে বেরুতে হয়।এই দেখ, তুমি ডাক্তারের কাছে যেতে বলার সাথে সাথে আমার হার্টবিটটা বেড়ে গেছে। ডাক্তাররাও সন্ত্রাসী কিনা কে জানে ?

পারভীন এমনভাবে তাকালো যেন মফিজের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। ধমকের সাথে বললো, রাস্তায় বেরুতে যদি এতো ভয় পাও তাহলে চব্বিশ ঘন্টা বউয়ের আঁচলের নিচে থাকো!

মফিজ খুব কষ্টে হেসে বললো, সেটাও যে আজকাল নিরাপদ জায়গা নয় পারভীন! এই ঢাকা শহরে মেয়েরা যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে তাতে করে আমি তাদের করেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।

— তবে? তবে কি করবে এখন? চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাও!

— সেটাও ভেবেছি। কিন্তু গ্রামও তো এখন আর নিরাপদ নেই।সেখানেও যেসব হত্যাকাণ্ড আর সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে তাতে করে আমি কেন, যে কোনো শান্তিপ্রিয় সাহসী মানুষও আর গ্রামে বসবাসের কথা ভাবতেও পারবে না। শহরে তবু তো অলিগলি আর ডাষ্টবিনের মধ্যে পালিয়ে হলেও কিছুটা আত্মরক্ষা করা যায়। কিন্তু গ্রামে তাও আর সম্ভব নয়। আগের দিনে হলে অবশ্য বাগান টাগানে লুকানো যেত। এখন তো আর গ্রামগঞ্জে বাগানও নেই। কেবল মানুষ আর মানুষ।

পারভীন হাসতে হাসতে বললো, তাহলে এক কাজ করো, তুমি ফকির দরবেশের মতো সোজা বনে জঙ্গলে চলে যাও। সেটাই তোমার জন্য নিরাপদ জায়গা হবে।

একটা দম ছেড়ে মফিজ বললো, তাও হবার নয়। কারণ বাংলাদেশের বন উজাড় প্রায়। যতটুকু আছে সেটুকুও গুপ্তঘাতকদের দখলে। তাদের নিরাপদ ট্রেনিং আর অস্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানেও জায়গা নেই।

— তাহলে তুমি আর কোথায় যাবে?

মফিজ হালকাভাবে বললো, জানো পারভীন, প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখি, সামনে মহা বিপদ। পালাবার কোনো পথ নেই। চারদিকে শত্রুদ্বারা বেষ্টিত। মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু বিশ্বাস করো, ওভাবে অপঘাতে মরতে আমার একটুও ভালো লাগেনা। মন খারাপ হয়ে যায়। আর তখন, ঠিক তখনই আমার সামনে খুলে যায় একটি অলৌকিক দরোজা।

— সেটা কি ? পারভীনের চোখে মুখে বিস্ময়।

— সেটা হলো, আমি তখন চোখ বন্ধ করি। আর সাথে সাথেই অনুভব করি, আমি হাওয়ায় মিশে ওপরে, ক্রমান্বয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি। ব্যাস! শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিবারই আমি এভাবে ঘুমের ভেতর বেঁচে যাই। ভাবছি— এই ঢাকা শহরে যদি আমার তেমনি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকতো দিনের বেলায়! জাগরণে!

মফিজের কথা তখনো শেষ হয়নি। এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠলো।

পারভীন বললো, তুমি বসো আমি দেখছি। এগিয়ে গিয়ে পারভীন দরোজা খুললো।

www.pathagar.com

মফিজ কান খাড়া করে আছে সেদিকে।

দরোজা খোলার সাথে সাথে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো দুটো ছেলে।

পারভীন শক্ত গলায় তাদেরকে বললো, কি চান আপনারা?

— আমরা এই মহল্লার ছেলে।

— তাই বলে ঘরে ঢুকে পড়বেন?

মফিজ এগিয়ে গেল সেদিকে। বললো, কি হয়েছে?

তারা বললো, আমাদের একটা ক্লাব আছে মসজিদের সামনে। ক্লাবের জন্যে আমরা চাঁদা তুলছি।

মফিজ একটু সাহস করে বললো, ও ক্লাবে তো রাত দিন মদ-জুয়ার আড্ডা চলে। মদ-জুয়ার জন্যে আমরা চাঁদা দিতে পারবো না ভাই। অন্য জায়গায় দেখুন।

ছেলে দুটো মফিজের দিকে এমন লালচোখে তাকালো যেন, সে-ই চুরি কিংবা অপকর্ম করে পাবলিকের হাতে ধরা পড়েছে।

মফিজকে থামিয়ে দিয়ে পারভীন বললো, দেখুন! এটা কলকাতা নয় যে, পুজো টুজোর নাম করে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করবে। এটা ঢাকা শহর। এখানে আমাদেরও কিছুনা কিছু আছে। যান! আমরা চাঁদা দেব না। আপনাদের মন্টি নেতাকে বলবেন, তার খালা আপনাদেরকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তাকে আসতে বলবেন।

ছেলে দুটো মন্টির খালার কথা শুনে মাজাভাঙ্গা সাপের মতো কেমন যেন নেতিয়ে পড়লো। তারপর 'স্যরি' বলে দ্রুত চলে গেল।

মফিজের চোখে মুখে বিস্ময়।

ওরা চলে যাবার পর সে জিজ্ঞেস করলো, মন্টি আবার কে? তুমি তার কেমন খালা হও? কই আমি তো এতো কালেও এসবের কিছু জানতে পারিনি?

পারভীন হাসতে হাসতে বললো, মন্টি হলো তাদের লিডার। তাকে কি ছাই আমিও চিনি! এ পাড়ায় তার নাম শুনেছি। নিশ্চয়ই ওর খালা টালা কেউনা কেউ থাকতে পারে। না থাকলেও অসুবিধা নেই। ওরা সাহস করে জানতেও চাইবে না। সেকি আর এদেরকে পাঠিয়েছে?

একেই বলে মেয়ে মানুষ! শরীরের প্রতিটি লোমকূপেই এদের অসংখ্য কূটবুদ্ধি লুকিয়ে আছে।

মফিজ একটু হাসলো। বললো, যাক বাবা বাঁচা গেল। অন্তত মহল্লার উৎপাতের ভয় আর থাকলো না। এখন ভাবছি তোমাকে সারাক্ষণ সাথে রাখতে পারলে হয়তো বা ঢাকা শহরে চলাফেরা করা যেত। এবার ক'টা টাকা দাও তো। আস্তে আস্তে ডাক্তারের কাছে যাই।

জামা কাপড় পরে পকেটে টাকা নিতে নিতে মফিজ বললো, তুমিও আমার সাথে চলোনা!

— আমার রান্না বান্না?

— এসে করো।

— না। তুমি জানো না, এই ভরা সন্ধ্যায় আমি বেরুতে পারবোনা। তাছাড়া এই ভারী শরীর নিয়ে রাস্তায় বেরুতেই আমার শরম করে।আমি হাঁটবো আর সবাই আমার দিকে

www.pathagar.com

ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকবে।

পারভীনের পেটের দিকে চেয়ে মফিজেরও কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে। বললো, ঠিক আছে। তুমি থাকো আমি ঘুরে আসি।

দরোজা খুলে মফিজ মাত্র এক পা বাইরে দিয়েছে আর তখনই পরপর কয়েকটি বোমার বিকট শব্দে পুরো মহল্লাটি কেঁপে উঠলো। ঠিক ঐ ছেলে দুটোর কাজ। কারা হয়তোবা চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছে। যার কারণে তারা বোমা ফাটিয়ে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

বোমার শব্দ শুনে পারভীন আবার দৌড়ে চলে এলো, বললো, কি হলো?

— কি আর হবে? তোমার বোনপোদের দৌরাত্ম্য! পারভীন হাসলো। মফিজ ক্ষোভে ফেটে পড়লো।

—তুমি হাসছো? আগে শুনতাম সিংহের গর্জনে মেয়ে মানুষের গর্ভপাত ঘটতো। পৃথিবী থেকে সিংহ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই স্থান দখন করে নিচ্ছে বোমা। বুঝলে, এখন বোমার শব্দেই মেয়ে মানুষের গর্ভপাত ঘটলেও অবাক হবার কিছু নেই।

গর্ভপাতের কথাটা শুনার সাথে সাথে পারভীনের কানদুটো গরম হয়ে গেল। অবচেতনে নিজের পেটের দিকে তার দৃষ্টিটা চলে গেল।

মফিজ জুতো খুলতে খুলতে বললো, না। তোমার অবশ্য তেমনটি এখনো হয়নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ?

পারভীন হাসিতে ফেটে পড়লো। বললো, দিন দিন তুমি যা হচ্ছো না! তোমার ভেতর যতই আতংকের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ততোই তুমি তাত্ত্বিক হয়ে উঠছো। এখন চুপ করে বসো। তোমাকে আর ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না।

মফিজ বললো, তোমার মাথা খারাপ ! আমার পা অচল হয়ে গেলেও আমি এখন আর বাইরে যেতে পারবো না। তার চেয়ে বরং খোড়া হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবো।

— হ্যা তাই থাকো। শুয়ে শুয়ে কেবল বউকে পাহারা দাও। তোমার তো আর অফিস নেই!

— আছে। ভাবছি কাল একটি ছুটির দরখস্ত পাঠিয়ে দেব। এই পা নিয়ে রিকসায় উঠলে আবার কোন দুর্ঘটনায় পড়ি তার কি ঠিক আছে? ঢাকার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! পায়ে পায়ে মৃত্যু।

রাত অনেক গভীর।

হঠাৎ একটা দু:স্বপ্নে মফিজের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখলো তার চারপাশে হত্যাকারী। তাদের হাতে চকচকে ছুরি। তারা তাড়া করছে মফিজকে। সে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সে আস্তে করে পড়ে গেল রাজধানীর রাজপথে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো হন্তারক। তাদের হাতে চকচকে ছুরি। একজনের হাতে পিস্তল। একজন কান ধরে, আর একজন চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললো মফিজকে। সে স্থিরভাবে দাঁড়াতেও পারছেনা। তার পা কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। তারা তাকে বাপ মা তুলে গাল দিতে দিতে বললো, পকেটে কি আছে বার কর।

— আমার কাছে তো কিছুই নেই।

— পকেট দেখা।

— এই দেখুন। ফাঁকা।

www.pathagar.com

— জামা উঁচু কর।

— দেখুন।

— প্যান্ট খোল।

প্যান্ট খুলে মফিজ কেবল জাঙ্গিয়াটা এঁটে ধরে মিনতি করে বললো, দেখুন আমার কাছে কিছুই নেই।

ওরা ধমকে উঠে বললো, নেই ? জাঙ্গিয়া খোল!

গলার সামনে পিস্তলের নল। ঘাড়ের রগে ছুরির শির শির স্পর্শ। জাঙ্গিয়া না খুললে হয়তোবা তারা তাকে মেরেই ফেলবে। অগত্যা বাধ্য শিশুর মতো জাঙ্গিয়াটাও খুলে ফেলতে হলো মফিজের।

খিল খিল করে হেসে উঠলো তারা। বললো, ছি! ওই মালটা ছাড়া তোর কাছে আর কিছুই নেই? ফকিরের বাচ্চা আর কাকে বলে! তারপর পাছায় একটা সজোরে লাথি কষিয়ে দিয়ে বললো, যা শালা!

কোথায় আর যাবে মফিজ! জামা প্যান্ট এবং জাঙ্গিয়া তাদের হাতে। লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। চোখ খুলে আবার উঠে দাঁড়াতেই সে দেখলো, তার বিবস্ত্র দেহটার দিকে তাকিয়ে শত শত মানুষ মুখে হাত চাপা দিয়ে কেবল হাসছে।

মফিজের খুব পেচ্ছাবের বেগ হলো। সে আর চেপে রাখতে পারলো না। রাজধানীর রাজপথের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রাবণের ধারার মতো ঝরঝর করে সে পেচ্ছাব করে দিল। সবার সামনে। সেকি ঘৃণায়, নাকি ভয় কিংবা আতংকে তা নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না মফিজ।

স্বপ্নটা দেখার পর মফিজ ঘেমে উঠলো। ভাবলো, আজকের স্বপ্নে আমি কেন আর হাওয়ায় মিশে যেতে পারলাম না? কেন অদৃশ্য হয়ে তাদের সামনে থেকে শূন্যের ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে পারলাম না? তবে কি আমি সত্যিই হন্তারকদের কাছে পরাজিত হতে চলেছি ?

হাত দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে মফিজ পারভীনের উঁচু পেটটার ওপর আঙ্গুল ছোঁয়ালো। মনে মনে বললো, পারভীন! তোমার পেটে কে আছে জানিনা। কে আসছে? যেই আসুকনা কেন? এই সন্ত্রাসী ঢাকা শহরে যদি সে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে সেও সম্ভবত বালিশের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র মাথায় দিয়ে ঘুমাবে। তার কাছেও চব্বিশ ঘন্টা অস্ত্র থাকবে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই একেকজন সাহসী যোদ্ধা। সেই জন্য তারা সব সময় সৈনিকের মতো অস্ত্রসাজে সজ্জিত থাকে।পারভীন! এই সন্ত্রাসের শহরে যদি তুমি বাচ্চা প্রসব করো তাহলে সেও এমনটি হবে। না, পারভীন! আমার সন্তানের তেমন সন্ত্রাসী সৈনিক হবার দরকার নেই। সে হবে সাহসী। কিন্তু সন্ত্রাসী নয়। সে হবে মানুষ। অমানুষ নয়। এই শহরে তোমার সন্তান প্রসব করার প্রয়োজন নেই পারভীন! ...

হাতের চাপটা বোধ হয় একটু জোরেই লেগেছিল পারভীনের পেটে। সে অতি কষ্টে পাশ ফিরে বললো, এই! দুপুর রাতে এসব কি হচ্ছে?

দ্রুত হাত টেনে নিতে নিতে মফিজ বললো, ওসব কিচ্ছুনা। আমি কেবল তোমাকে একটু দেখছিলাম।

— এত রাতে নতুন করে দেখার আবার কি হলো?

— এমনিই।

www.pathagar.com

— কিছু বলবে মনে হয় ?

— হ্যা, আমার খুব ভয় করছে।

— কেন ?

— জানিনা। চলো আমরা গ্রামে ফিরে যাই।

— এ সময়ে আমি জার্নি করতে পারবো না। তাতে ক্ষতি হতে পারে।

— আমি চাইনা আমাদের সন্তান এই সন্ত্রাসের আস্তানায় জন্মগ্রহণ করুক।

— কি বলছো তুমি ?

— যা বলছি তা আমার ধারণা। আমার বিশ্বাস। আমার অনুভূতি।

— কেন ?

— আমার মনে হয়, ঢাকা শহরে একটি শিশুর জন্ম দেয়া মানেই আর একটি সন্ত্রাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

— পাগল আর কাকে বলে!

পারভীন মুখ টিপে হাসলো।

এক সপ্তাহ পর আজ মাত্র অফিসে গেছে মফিজ। অফিস থেকে বেরুবার সময় কেন জানি মনে হলো তার পিছু নিয়েছে কোন হন্তারক।

সেদিনের স্বপ্নের মতো আজ যদি সত্যি সত্যি তাকে এই জন–সমুদ্রে উলঙ্গ করে পাছায় লাথি মারে—তাহলে দশবার কবরে গিয়েও তো সেই লজ্জা ঢাকতে পারবেনা মফিজ। কি করবে বুঝে ওঠার আগেই সে অনুভব করলো, তার ঘাড়ের পেছন থেকে কেউ যেন ছুরি ঠেকিয়ে বলছে, শা লা!...

মফিজ আর কিছু ভাবতে পারলো না। সে উর্ধশ্বাসে দৌড় দিল। সে ছুটছে। সে ছুটছে ঢাকা শহর পেছনে রেখে ক্রমাগত সামনের দিকে।

আর তখনো সে অনুভব করছে, তার পেছন থেকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো কেবলই তাড়া করে ফিরছে বিশ্ব–বিখ্যাত ডাকাত—সন্ত্রাসী ঢাকা। ■

www.pathagar.com

টান

অন্ধকারের কুয়াশারা তখনো গরম ভাতের ধোঁয়ার মতো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাজুল বালিশে এপাশ-ওপাশ করে দুবার হাই তুলে জরিনাকে ডাকলো, কই শুনচো?

গ্রামে রাত দশটা মানে অনেক রাত। এতরাত পর্যন্ত সাধারণত কোনো বাড়িতে আলো জ্বলে না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সবাই একটু রাত হলেই খেয়ে দেয়ে বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ক্লান্ত শরীরে তখন রাজ্যির ঘুম নেমে আসে। জরিনা সংসারের সবাইকে খাইয়ে হাঁড়ি-পাতিল গুছিয়ে তারপর গোয়ালে যায়। গরুর খড়বিচালী দিয়ে এরপর তার ছুটি। তখন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শোবার সাথে সাথেই তার চোখ দুটো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ঘুমিয়ে থাকার কারণে তাজুলের ডাক সে শুনতে পায়নি। তাজুল এবার বিছানায় উঠে বসে। জরিনার দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

গ্রামের মেয়ে জরিনা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বউ। পুরনো ব্লাউজটা ছিঁড়ে তার ফাঁক দিয়ে জরিনার পিঠ এবং পেটের সিংহভাগ বেরিয়ে পড়েছে। বালিশের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো গুছিয়ে পুনরায় পাশ ফিরে শোয় জরিনা। একটি আহত পাখি তাজুলের ভেতর আছড়ে পড়ে। ইচ্ছাগুলোকে অবদমিত করে আবার ডাক দেয়, জ রি না।

আহ্ কি কবা কও।

আমার ওপর কি রাগ কল্লি জরি?

না, রাগ করবো কেন। তোমার ওপর কি রাগ কত্তি পারি। জরিনা বুঝতে পারলো এসব কিসের ইঙ্গিত। সে আর দেরি না করে বললো, তবে এসো।

পাড়ার কেউ এখনো জাগেনি। কুলতলায় নেড়ি কুত্তাটা কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। খুব সকালে তাজুল গামছাটা কাঁধে নিয়ে পুকুরের দিকে যাবার সময় কি মনে করে গোয়ালের দিকে গেল। গোছল সেরেই সে লাঙ্গল নিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়বে।

গত বছর মাঠে তেমন ফসল না হবার কারণে একটি গরু বিক্রি করে খেতে হয়েছে। আর আছে মাত্র ছোট ছোট দুটো গরু। এই দিয়ে কোনো রকমে হালচাষের কাজ চালাতে হয়। এবারেও যদি ফসল না হয় তাহলে ভাগ্যে অনেক দু:খ আছে। এসব ভাবতে ভাবতে তাজুল গোয়ালের সামনে এসে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

গোয়ালের দরোজা খোলা। গোয়াল শূন্য। তাজুল শূন্য গোয়ালের দিকে তাকিয়েই চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলো। বারান্দায় ঘুমন্ত তাজুলের মা নছিরনও ধড়ফড় করে জেগে গেছে। প্যারালাইসিসে তার পা দুটো অচল। হাঁটতে পারে না। বারান্দা থেকে বললো, কি হইছেরে তাজু? কানচিস ক্যান?

মায়ের কথার কোনো জবাব দিতে পারে না তাজুল। তার কান্নার শব্দে নছিরনও কেঁদে ওঠে। কিন্তু কি জন্যে তার ছেলে কাঁদছে সে কিছুই বুঝতে পারে না। ততোক্ষণে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে তাজুল মাটিতে শুয়ে পড়েছে। নছিরন মেয়েলি কান্নার সুরে চিৎকার দিয়ে উঠলো। ওরা তুরা কেডা কনে আচিসরে, আয়। আমার তাজুরে বোদয় সাপে কাটিচে। আমার বাপজানরে তুরা বাঁচা। ও আল্লা, আল্লাগো.....।

www.pathagar.com

নছিরনের কান্নার শব্দে জরিনাও ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এলো। তাজুল মুখে কিছু বলছে না। কেবলই বুক চাপড়িয়ে কানছে। জরিনা তাজুলের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলো, তুমার কি হয়েচে কবা তো!

তাজুল কানতে কানতে গোয়ালের দিকে আঙুল তুলে বললো, দ্যাক জরি দ্যাক, আমাগের সব্বোনাশ হয়ে গেচে।

গোয়ালের দিকে তাকাতেই জরিনার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সে কেবল একবার জোরে কেঁদে উঠেই স্তব্ধ হয়ে পড়লো। ততোক্ষণে তাজুলের উঠোনে পাড়ার লোকেরা এসে ভিড় জমিয়েছে। জেগে উঠেছে গ্রামের সকল মানুষ।

আজ অমাবস্যা।

সন্ধ্যার পর পরই ঘন অন্ধকারে পাড়াটি ছেয়ে ধরেছে। মাতব্বরের উঠোনে পাড়ার সকল মানুষ। বিড়ির আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রজব আলী বললো, ও তাজু, তা এটটা আলোর ব্যবস্তা কর। আমরা তো আর অন্দগারে বসতি পারিনে। আইচি তো তোর কাজে। দু এটটা বিড়ি-টিড়ি দে।

মাতব্বরের বাড়িতে কাজ করে রজব আলী। সারাদিন কাজ করার পর রাতে বাড়িতে গিয়ে ঘুমায়। রজব আলীর কথার মধ্যে একটা ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ লুকিয়ে ছিল। কিন্তু সেটা কেউ না বুঝলেও তাজুল বুঝতে পারে।

কাল সকালেই তাজুলকে রজব আলী বলেছিল, ও তাজু, তোর বয়েস তো আর কম হলো না। বে করেচিস সেই কত্তকাল আগে। একোনো ছেলেপিলের দেকা নেই। অমন বউ নে ঘর কল্লি শেষে তোর ভিটেয় ঘুগগু চরবে। মাতবর কচ্চিলো বউডারে ছাড়ে দে আর এটটা বে করার কতা।

পাড়ার মধ্যে জরিনা বেশ সুন্দরী বউ। এজন্যে সবাই তাকে হিংসে করে। মাতব্বরের ঘরে দুটো বউ থাকলেও তার চোখ জরিনার দিকে। সন্ধ্যায় অকারণে তাজুলের বাড়িতে এসে গায়ে পড়ে খবরদারি করা তার স্বভাব। রজব আলীর কথার ইঙ্গিত সে বুঝতে পারে। রাস্তার পাশে লাঙ্গল জোয়াল রেখে তাজুল রজব আলীর গালে জোরে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলে, আমার ভিটেয় ঘুগগু চরুক না কুত্তা চরুক তাতে তোর কি হারামখোর!

গালে হাত বুলোতে বুলোতে রজব বললো, তুই আমারে মাল্লি? ঠিক আচে, মাতবর চাচাকে গিয়ে কবো। এর প্রতিশোদ নে তারপর কথা।

পাড়ায় কথাটি যেন কিভাবে জানাজানি হয়ে গেল যে মাতাব্বর জরিনাকে বিয়ে করতে চায়। তাজুল তাকে তালাক দিলেই মাতব্বরের জন্যে কাজটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তাজুল জরিনাকে ছাড়তে রাজি নয়। তার মা নছিরনও বলে, নাগো, বউমা আমার সুনার মায়ে। না হোক বাচ্চা-কাচ্চা। তাতে কি! তবু এমুন বউকে আমি ছাড়তি দোবো না। তাজু, ও তাজু তুই বাপ মন খারাপ করিসনে। আল্লাই দিলে দেকপি মরা গাচে ফল ধরিচে। আমার মাথায় হাত রাখি ক' বউকে ছাড়বিনে।

তাজুল তার মাকে কথা দেয়। তার বউকে সে ছাড়বে না। এ নিয়ে কত মানুষ কত কথা বলে। তাজুল তাদেরকে বোঝায়। বলে, ছেলেপিলে না হবার জন্যি বউ ছাড়বো ক্যান? আর এটটা বউ আনলি তারও যদি এমুন হয়।

তাজুলের কথায় সবাই অবাক হয়। লেখাপড়া না জানা তাজুলেরও কাণ্ডজ্ঞান আছে তাহলে!

মাতব্বরের উঠোনের একপাশে বসে আছে তাজু। তার পেছনে ঘোমটা টেনে বসে আছে

www.pathagar.com

জরিনা। সেও সালিশ শুনতে এসেছে। মাতব্বর হেড়ে গলায় বললো, তা কও তাজু, তুমার কি কারু করে সন্দ-টন্দ হয়?

পাড়ার সবাই তাজুলের দিকে চেয়ে থাকে। তাজুল নিশ্চুপ। অন্ধকারে তার মুখটিও দেখা যায় না। তার আশপাশের লোকেরা বলে উঠলো, ও তাজু কয়ে ফ্যালাও না। রাত হচ্চে। ঘুমুতি হবে। সারাদিন খাটা-খাটনির শরীল। আর বসতি পাচ্চি নে। যা কবার তাড়াতাড়ি কও তো দেকি!

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতায় ছেয়ে থাকে উঠোনটি। মাতব্বর নীরবতা ভেঙে বললো, তাইলি আর কি। তাজুর যকন কারু করে কোনো সন্দ নেই, তকন আমরা আর কি করবো। ঠিক আচে, তুমরা বাড়ি যাও। আমি পরে দেকপো, তার কোনো উপগার কত্তি পারি কি না।

আচ্চা ঠিক আচে। আমরা তালি যাই। বলে সবাই উঠতে যাবে এমন সময় জরিনা হুংকার দিয়ে উঠলো। তাজুলের গায়ে ধাক্কা মেরে বললো, তুমি কিচু ক'বা না আমি কবো?

তাজুলের মুখ খোলার আগেই জরিনা বললো, না! আপনারা কেউ যাবেন না।

জরিনার দিকে তাকাতে তাকাতে আবার যার মতো সে বসে পড়লো। জরিনা বললো, আমার সন্দ হয়। আপনেরা কি শুনবেন? তার কোনো বিচার কত্তি পারবেন?

সবাই বললো, তা কওনা শুনি। তারপর দেকা যাবে। বিচারের জন্যিই তো ইকানে আইচি।

মাতব্বরও কান খাড়া করে বললো, কি কতি চাও, কও।

জরিনা বললো, আমার সন্দ হয়-আমাগের গুরুদুডো ঐ মাতবরের কতামতো চুরি করেছে রজব আলী।

জরিনার কথা শেষ না হতেই উঠোনে প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হয়ে গেল। পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দলে তারা মুহূর্তেই বিভক্ত হয়ে গেল। মাতব্বর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, কি এত্তবড় সাওস! আমার উটোনে দাঁড়ায়ে, আমার ছামনে এত্তবড় কতা! আমি চোর? তুমাগের গরু আমি চুরি করিচি? শুনলে তুমরা, শুনলে ওর কতা?

মাতব্বরের পক্ষের লোকেরা বললো, গরু চুরির বিচার পরে হবে, আগে এই কতার বিচার হতি হবে।

রজব আলী বিচালি গাদার নিচ থেকে বাঁশ বার করে লাফিয়ে পড়লো তাজুল এবং জরিনার দিকে। তাজুলের পক্ষের লোকেরা এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লো। হ্যায়, হ্যায়, ঠিকই কয়েছে জরিনা ভাবী। মাতবরের অত্যাচার এতদিন আমরা সইচি। তার ভয়ে কেউ কতা কইনি। এবার আর না। এর বিচার হতি হবে। এ বিচার একেনে হবে না। চল্ আমরা উটি। কাল আমরা পরিষদে যাবো। তারপর দ্যাকপো।

দুদিন পর, পরিষদে লোকে লোকারণ্য। পা রাখার জায়গা নেই। স্বয়ং মাতব্বরের বিরুদ্ধে নালিশ। তাও গরু চুরির। ঘটনাটা মুখোরোচক। বাতাসের আগে খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। চেয়ারম্যান সাহেব লোক দ্বারা মাতব্বরকে ডাকিয়েছেন। মাতব্বর ইউনিয়ন পরিষদের এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। সবাই চেয়ারম্যান সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে। চেয়ারম্যান সাহেব মাতব্বরকে সামনে আসতে বললেন। তারপর তাজুলকে তার অভিযোগ বলতে বললেন। তাজুল নির্ভয়ে আদ্যপান্ত সকল কথা বললো। গরু চুরির ঘটনার সাথে তার পারিবারিক ব্যাপারটি যুক্ত—একথা চেয়ারম্যান সাহেবকে বুঝাবার চেষ্টা করলো তাজুল। তার কথা শেষ হবার পর চেয়ারম্যান সাহেব মাতব্বরকে বললেন, আপনার কি কিছু বলার আছে? আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, আপনি নির্দোষ?

মাতব্বর রাগে ক্ষোভে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। আমার মান সম্মান নে টানাটানি! আমার

www.pathagar.com

কি সম্পত্তির অবাব আচে? আমি ক্যান গরু চুরি কত্তি যাবো ?

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, কেন চুরি করবেন সে কারণটা তো আপনারই জানবার কথা। আপনিই বলুন, কেন চুরি করেছেন?

না, আমি চুরি করিনি।

তাহলে কে করেছে তা আপনি জানেন ?

না, আমি জানিনে।

সত্যিই কি আপনি জানেন না?

না!

বেশ, তাহলে এবার বলুন, কাল রাত থেকে রজব আলীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

তা আমি কি করে কবো?

মাতব্বর! চেয়ারম্যান সাহেব এবার ধমকের সাথে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনাকে বলতে হবে।

মাতব্বর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, দ্যাকেন চেয়ারম্যান, ভোট দে আপনাকে পাশ করাইচি। আমি মুরুব্বি মানুষ। সম্মান করে কতা কবেন। এত লোকের মদ্যি আমার বেইজ্জতি কল্লি ভাল হবে না কলাম।

চেয়ারম্যান সাহেব মুচকি হেসে বললেন, আমি তো আপনার একার চেয়ারম্যান নই। আমি এই ইউনিয়নের সবার চেয়ারম্যান। অপমানের ভয় তাহলে আছে। তা যাক, এবার বলুন সত্য কথা। না বললে এরচেয়েও ভয়ংকর অপমান আপনার ভাগ্যে আছে। এখনো স্বীকার করুন।

মাতব্বর ঘাড়বাঁকা করে তখনও অস্বীকার করছে। এর মধ্যে হঠাৎ ভিড় ঠেলে কুদ্দুস ঢুকে পড়লো। পেছনে রজব আলী। চেয়ারম্যান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে কুদ্দুস বললো, চেয়ারম্যান ভাই, আমি বাঁশ বাগানের পাশে ইটের পাঁজা থেকে ইট আনতে ছিলাম। দেকি, পাঁজার মদ্যি ঘাপটি মেরে বসে আচে। আমি ধরি নিয়ে আলাম।

পরিষদ কক্ষের সবাই রজব আলীর দিকে তাকিয়ে আছে। চেয়ারম্যান সাহেব রজবকে বললেন, কি ব্যাপার রজব আলী, তাজুল যা বলছে তা কি সত্যি? আশা করি তুমি মিথ্যে বলবে না।

রজব আলী একবার মাতব্বরের দিকে, একবার উপস্থিত জনতার দিকে আর একবার চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে নিল। তারপর বললো, চেয়ারম্যান ভাই, যত পাই করি না ক্যান, আপনার ছামনে মিত্তে কতা কতি পারবো না। আপনি ফেরেচতার মতোন লোক। আপনাকে মিত্তে কতা কলি আল্লা আমার জিব্বা কাটে নেবে।

সবাই শব্দ করে উঠে বললো, তাহলি কয়ে দ্যাও না ক্যান রজব? সত্যি কতাটা কতি এত দেরি কিসের?

চেয়ারম্যান সাহেব সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তারপর রজব আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যা বলো। তোমার কোনো ভয় নেই।

রজব আলী অভয় পেয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বলে দিল। মাতব্বরের কথামতো সে যে গরু চুরি করে তার মেয়ের বাড়িতে রেখে এসেছে তাও বললো। জরিনার ওপর মাতব্বরের যে বরাবর লোভ এবং তার জন্যেই যে তাজুলকে যখোন তখোন উত্যক্ত করেছে সে কথাও বলে দিল। রজব আলীর কথা শেষ না হতেই উপস্থিত জনতা ধেই ধেই করে ছুটে এলো মাতব্বরের দিকে।

জরিনা তাজুলের গায়ে টোকা দিয়ে বললো, চলো। বাড়ির দিকে যাওয়া যাক। ■

www.pathagar.com

ফাটল

মাঝখানের দেয়ালটি যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। অশোকের-বাবা গদাই মাঝখানের দেয়ালটি তুলেছিল বহুকাল আগে।

দেয়ালের এপাশে খুব ছোট্ট একটি বাড়ি। ছোট্ট একটি উঠোন। তবুও এই ছোট্ট উঠোনটির প্রতি গদাই সব সময় লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার ভয়ংকর দৃষ্টিতে যেন প্রাচীর নামক এই ফাটা দেয়ালটি গলে একাকার হয়ে গদাইদের উঠোনের সাথে মিশে যেতে চায়।

ক'দিন যাবত গদাইদের আচার ব্যবহার খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। তাদের হাবভাব ভালো ঠেকছে না রুমানার কাছে। রুমানা খুব অস্থিরভাবে এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করছে। রাগে আর ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। ভেজা চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে হাঁটু পর্যন্ত। সুন্দর লাল সুডৌল মুখটিতে ক্রোধের আগুন। রুমানা বাঘিনীর মতো কেবলই ফুঁসছে।

রুমানা হরিপদকে ডাক দিল। কয়েকবার। কিন্তু হরিপদের কোনো সাড়া শব্দ নেই। এবার জোরে ডাকলো, কিরে হরিপদ, কোথায় আছিস, শুনতে পাচ্ছিস নে!

হরিপদ এ বাড়িতে আছে ছোটকাল থেকে। তার বাবা কালিপদ ছিল এ বাড়ির পুরনো কর্মচারী। কালিপদ মরবার আগেই হরিপদকে এনে রুমানাকে বললো, আমার এই মা মরা ছেলেটিকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। আমরা আপনাদের পুরনো চাকর। আপনাদের নুন খেয়ে বড় হয়েছি। তিনকাল পার হয়ে এখন চারকালে পড়েছি। আর হয়তো বেশিদিন বাঁচবো না। আমার হরিপদকে আপনার কাছে রেখে আমি নিশ্চিন্তে মরতে চাই।

তার দাবী রুমানা ফেলতে পারলো না। হরিপদ তখন খুবই ছোট। তাকে পাশের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল রুমানা। তার জামা কাপড় বই খাতার সব দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত হরিপদ কোনোরকমে স্কুলে গেল। তারপর থেকে শুরু হলো তার দুষ্টমি।

প্রতিদিন রুমানার কাছে নালিশ আসে, হরিপদ আজ অমুক ছেলের মাথা ফেটে দিয়েছে। অমুকের বই চুরি করেছে। অমুকের গাছ কেটে দিয়েছে। এসব শুনতে শুনতে রুমানার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। হরিপদকে কাছে ডেকে নিয়ে রুমানা বলে, দেখ হরিপদ, লেখপড়া শিখলে তোরই লাভ হবে। তুই বড় হবি। তুই মানুষ হবি– এজন্যেই আমি তোর পেছনে এত সময় দিচ্ছি। এত চেষ্টা করছি। তোর বাবা তো এমনটি ছিল না। তুই কেন এমন হলি? রুমানার কথা যেন হরিপদের কানেই যায়নি।

সময়ের পরিবর্তন হলেও তার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হলো না। সে আর স্কুলেই গেল না। সেই থেকে বাসায় থাকে। বাসার কাজ কর্ম করে। এই বিকেলে, হরিপদ দিব্যি ঘুমুচ্ছে। রুমানা আবার ডাক দিল। হরিপদ!....

রুমানার শেষের ডাকে হরিপদ পড়ি কি মরি করে ছুটে এলো। তার পরনের কাপড় কোমর থেকে নিচে নেমে গেছে। রুমানা বললো, এখনো কাপড়টিও পরতে শিখিসনি? ঠিক করে কাপড় পর।

হরিপদ কাপড় পরতে পরতে রুমানার দিকে তাকালো। রুমানা জিজ্ঞেস করলো, লিমা কখন

www.pathagar.com

বাইরে গেছে, কোথায় গেছে তুই কি জানিস?

হরিপদ মাথা নিচু করে আছে। রুমানা বললো, কিরে কথা বলছিস নে কেন? মাথা তোল।

হরিপদ এবার মাথা তুলে বললো, আপামনি বলতে মানা করেছেন।

কেন?

জানিনে।

তুই বল। তোর কোনো অসুবিধা হবে না।

হরিপদ ভয়ে ভয়ে বললো, অশোকদার বাড়িতে গেছে।

তার জবাব শুনে রুমানার চোখের সামনে যেন অন্ধকারের একটি কালো পর্বত দাঁড়িয়ে গেল। বললো, এখন কাজে যা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যা পেরিয়ে অনেক রাত। এখনো লিমা ঘরে ফেরেনি।

রুমানা অসহায়ভাবে জহিরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, সত্যিই, বোধহয় আমি হেরে গেলাম। তোমার কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো জহির। আমি পারলাম না।

জহির যেন ফ্রেমের ভেতর থেকে বলে উঠলো, কেন? পারবে না কেন? তোমাকে পারতেই হবে রুমানা। তোমাকে তো হারলে চলবে না।

ক্লান্তভাবে রুমানা বললো, কিভাবে পারবো বলো। লিমাকে নিয়ে আমার যে সবুজ স্বপ্ন ছিল, তার ভেতর আমি যে ইচ্ছের বৃক্ষকে বড় করতে চেয়েছিলাম, মেয়েটি সে কথা একবারও ভাবলো না। সে বুঝতেই চাইলো না, আমি তার মঙ্গল কামনা করি। তার কল্যাণ চাই। সে ভাবে, আমি তার আজন্ম শত্রু। আমার কোনো কথাই সে শোনে না। আমার কোনো আদেশ নিষেধেরই সে তোয়াক্কা করে না। এমনটি কেন হলো, বলো। আমি তো এমনটি আশা করিনি জহির! বলতে বলতে রুমানা ছবিটি আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

হরিপদ দ্রুত ঘরে ঢুকে বললো, এসেছে।

কে?

আপামনি।

কোথায়?

ও ঘরে।

রুমানা মেয়ের ঘরে ঢুকে দেখলো, লিমা চেয়ারে বসে আছে ঘাড় গুঁজে। তার গায়ে হালকা জামার আচ্ছাদন। এতই ফিন ফিনে সাদা পোশাক যে, লিমার যৌবন এবং শরীরের ভাঁজগুলো ঢাকতেও চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তার অন্তর্বাসটিও কেমন বেহায়ার মতো স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে। দেখে রুমানার শরীর জ্বলে গেল। ভরা যুবতী একটি মেয়ে। তার এতটুকু যদি আক্কেল থাকে। মান-সম্মানের এতটুকু ভয়ও কি থাকতে নেই? যত্তসব বেশরম! লিমাকে খুব গালি দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু রুমানা জানে, তাতে কোনো কাজ হবে না, বরং বুমেরাং হয়ে অধিক যন্ত্রণার কাঁটা হৃদয়ে এসে বিঁধবে। সে পেছন থেকে লিমার মাথায় হাত রেখে বললো, আমাকে কিছুই না বলে কোথায় গিয়েছিলে?

লিমা টেবিল থেকে মাথা তুলে বুকটান করে জবাব দিল, আমি কোথায় যাবো না যাবো, কি করবো না করবো তার জন্য কি তোমার অনুমতি নিতে হবে? আমি কি তোমার চাকর যে তোমার হুকুম ছাড়া পা বাড়াতে পারবো না?

রুমানা মেয়ের এই অপ্রত্যাশিত জবাবে খুব আহত হলো। রাগে ক্ষোভে তার দু'চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। দু'গালে দু'টো চড় বসিয়ে দিতে তার ইচ্ছে হলো। কিন্তু সেটা করলো না।

www.pathagar.com

নিজেকে শান্ত রেখে বললো, তুমি ওভাবে কথা বলছো কেন? আমি তোমার মা। একমাত্র অভিভাবক। তুমি বড় হয়েছো। দায়িত্বের সাথে কথা বলা তোমার উচিত।

লিমা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো হুংকার দিয়ে উঠলো। বড় হয়েছি। ভালো-মন্দ বুঝার বয়স আমার হয়েছে। আমার ওপর খবরদারি করতে আসো কেন? আমাকে আমার মতো চলতে দাও।

তা হয় না। তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো না।

কেন?

অতোটা স্বাধীনতা ভোগ করার মতো বয়স-বুদ্ধি এখনো তোমার হয়নি। তুমি এখনো বোঝো না সমাজ-সংসারের নিষ্ঠুরতা।

খুব বুঝি।

কি বোঝো?

আসলে তুমি আমার সামনে কেবল নিষেধের পাহাড় তুলে ধরতে চাও।

মোটেই না। দেখ, আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাইনে। বাড়িতে একটি ছেলে আছে। হোক না সে কাজের মানুষ। তবু তো সে সবই বোঝে। আমি চাইনে লেখা পড়া বাদ দিয়ে তুমি অন্যদিকে খেয়াল দাও। জানো, তোমার চালচলনে চারপাশে কথা উঠছে? এসব নোংরা কথা শুনতেও আমার বমি আসে। তোমার আব্বার কথাও কি তোমার একবার মনে পড়ে না?

আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না তো! গা জ্বলে যায়!

কি বললে?

হ্যাঁ যা বলেছি তাই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

আমি অশোককে বিয়ে করবো। মাঝখানের দেয়ালটাকে আমি ভাঙ্গতে চাই।

লিমা... !

প্রথম। এই প্রথমই রুমানা মেয়ের গালে সজোরে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

লিমা গালে হাত বুলোতে বুলোতে নি:শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। উজ্জ্বল আলোতে ডান হাতটি রুমানা মেলে ধরলো। হাতের শিরাগুলো ইলেকট্রিক তারের মতো ফুলে উঠেছে। জহিরের ছবিটি বুকে নিয়ে কেঁদে উঠলো রুমানা। পারলাম না জহির! আমি বোধ হয় হেরে গেলাম।

জহির যেন হেসে উঠলো। হাসিটা এত নিষ্ঠুর যে রুমানা শিউরে উঠলো। বললো, আমার ব্যর্থতায় তুমি হাসছো?

জহির বললো, তুমি তো ব্যর্থ হতে চাওনি কখনো!

এখন হচ্ছি। কিন্তু কেন? কোন পাপে? কোন অভিশাপে?

জহির নিষ্কম্প ঠোঁটে বললো, সেটা তোমার কাছেই তুমি প্রশ্ন করো।

জহির! আমি আর পারছিনে। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

জহির ফ্রেমের ভেতর থেকে জোরে হেসে উঠলো। ক্ষমা? কাকে? তুমি ক্ষমা চাচ্ছো? এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার ঐ দুর্বিনীত স্বাধীনতার ঘোড়া কি এত সহজেই পরাজয় বরণ করবে? তুমি তো চেয়েছিলে নিজের মতো করে উড়তে। তিলে তিলে তুমি আমাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছো। আমাকে নি:শ্বেষ করেছো। তোমার মতো করে তোমার মেয়েকে গড়তে চেয়েছিলে। গড়েছো। এখন তার ফল ভোগ করো। আর বুঝতে চেষ্টা করো লাঞ্ছনার গ্লানি কত কঠিন।

www.pathagar.com

রুমানা কানতে কানতে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

রাত অনেক গভীর। এখনো লিমা ফেরেনি। রুমানা তবুও অপেক্ষায় আছে। বাইরে কি ঝড় বইছে? এত মর্মান্তিক শব্দ কিসের?

হরিপদ ছুটে এসে বললো, আপামনি ফিরেছে।

রুমানা উঠলো না।

হরিপদ দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর আবার বললো, আপামনি ফিরেছে।

রুমানা কিছুই বললো না।

হরিপদ ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর রুমানা পাশ ফিরতেই দেখে লিমা তার পায়ের কাছে নি:শব্দে বসে আছে। সে অবাক হলো।

লিমা ডাকলো মা। ....

রুমানা নিরুত্তর।

লিমা আবার ডাকলো, মা।...

লিমার ডাকটি এত ম্লান, এত করুণ যে, রুমানার ভেতরটা দুলে উঠলো। বললো, কি হয়েছে?

মা, আমি ফিরে এসেছি।

তার মানে?

লিমা কাঁদোস্বরে বললো, আমি আবার অশোকের কাছে গিয়েছিলাম। ওকে দেখলাম, আমার সাথে সম্পর্কের পেছনে ওর লোভ ছিল আমাদের সম্পদ এবং এই উঠোনটির প্রতি। ওর এই ইতর মানসিকতা এবং স্বার্থপর চরিত্র থেকে বুঝলাম, আসলে মাঝখানের দেয়ালটা আমাদের জন্যে খুবই জরুরী। এই দেয়াল না থাকলে ওরা আমাদেরকে নি:শেষ করে ফেলবে, মা!...

বলতে বলতে লিমা রুমানার বুকের ওপর আছড়ে পড়লো। বললো, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তারপর রুমানার গলা জড়িয়ে জোরে কেঁদে উঠলো লিমা। মাগো, তুমি কেন এত দেরিতে আমাকে শাসন করলে? প্রথম থেকেই তোমার ঐ পাথরের মতো শক্ত হাতে আমার স্বাধীনতানামক স্বেচ্ছাচারিতার ডানাদুটোকে ভেঙ্গে দাওনি কেন? বলো, কেন?

রুমানা মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিজের মনেই বললো, অশুভ ডানাদুটোর মোহে আমিও তো মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলাম। ধীরে ধীরে ওদুটো বেড়ে উঠেছিল আমার মধ্যেও। আমি তার ফল ভোগ করেছি। কিন্তু আর না। ডানাদুটোকে এখনই ভাঙ্গতে হবে। তা না হলে তো তুইও অসহায় হয়ে পড়বি!

এক সময় রাতের নিস্তব্ধতায় দু'জনকে ঢেকে দিল কোমল নিদ্রা। তারা ঘুমিয়ে আছে। বহুদিন পর তাদের চোখে প্রশান্তির ঘুম নেমে এসেছে।

ঘুমের ভেতর তারা দেখলো, দেয়ালের সামনে একটি ফাটল কুমিরের মতো হা করে আছে। ফাটলের ভেতর বিষধর সাপ। লিমা ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো–সাপ সাপ!

রুমানা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে পরম সাহস এবং নির্ভরতার সাথে দেয়ালের কাছে গেল। তারা দু'জনেই ফাটা দেয়ালটি সংস্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ভোরের সোনালী সূর্য রুমানা এবং লিমার চোখের ওপর আছড়ে পড়লো। তারা দু'জনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।■

www.pathagar.com

চতুর্দোলা

দরোজায় অন্তত পাঁচবার নক করবার পর ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। পুরো মহল্লা অন্ধকারে ডুবে আছে। কে যে দরোজা খুলে দিল, তাও বুঝা গেল না। গলার শব্দে অবশ্য কম বয়সী কোনো মেয়েরই কণ্ঠ শুনা গেল। এ বাসায় আবার কবে থেকে কিশোরী প্রবেশ করলো! ভাবনাটি যে একবারও মাথায় আসেনি, তা নয়। তবুও বেশি দূর এগুনো গেল না। মেয়েটি একরকম ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান?

একবার ঢোক গিলে কাশেম বললো, সাইদুল কি বাসায় আছে?

হ্যা আছে। ঐ ঘরে। বলে মেয়েটি ভেতরে আসতে বললো।

'ঐ ঘরে' মানে কি কাশেম জানে। দক্ষিণের পাশের ঘরটিতে সাইদুল আছে।

ঘরটিতে হারিকেন কিংবা একটি মোমও নেই। কী গাঢ় অন্ধকার। সাইদুলকে ডাকতে ডাকতে কাশেম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

ঘরের দেয়াল ঘেঁষে একটি ছোট খাট। খাটের এক কোণে গুটিশুটি মেরে বসে আছে সাইদুল। কাশেমের ডাকটি যেন তার কানে প্রবেশই করেনি। সে আবার ডাকলো। সাইদুল এবার কিছুটা নির্মোহভাবে বললো, আয়।

সাইদুলের আয় শব্দটির সাথে বেরিয়ে এলো চল্লিশ ডিগ্রির মত উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

কাশেম বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত হলো। সে কীরে! এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘরের কোনায় একাকী বসে আছিস যে!

সাইদুল নিরুত্তর।

প্রশ্নের জবাব না এলে কথাও থেমে যায়। ছেদ পড়ে প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতায়। কিন্তু কথা বলার জন্যই তো রিকসাভাড়া দিয়ে, কষ্ট করে এ পর্যন্ত আসা। কাশেম প্রসঙ্গ পাল্টায়। তা বল না, কেমন আছিস ?

সাইদুল এবারও জবাব না দেয়ায় কাশেম কিছুটা অপমানিত হলো। তারও কণ্ঠে শ্লেষ আর বিরক্তি। কি হয়েছে তোর! অমন পেঁচার মত করে আছিস কেন! ফোনে বলেছিলাম দেখা করতে, করলি না। বাসায় এলাম, তাও কথা বলছিস না। আমার অপরাধটা কি বলতো?

সাইদুল একটি হাতপাখা এগিয়ে দিতে দিতে বললো, কারুর কোনো অপরাধ নেই। যত দোষ আমার।

কাশেম বোঝে, সাইদুলের এটাও একটা রাগের কথা। কিন্তু কেন? তার ওপর রাগ কিসের?

প্রসঙ্গ পাল্টানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কাশেম ভাবটা এমন দেখালো যেন সে অনেক

www.pathagar.com

ভেবে নিয়ে কথা বলছে। আসলে সে কিছুই ভাবেনি। সাইদুলকে অন্যমনস্ক করাই তার লক্ষ্য। বললো, জানিস, আজ বিকেলে—

আজ বিকেলে কি ? জানতে চাইলো না সাইদুল। তবে বুঝা গেল সে এবার মনোযোগী হয়ে উঠেছে কাশেমের প্রতি। জিজ্ঞেস করলো, আজ বিকেলে মানে?

সাইদুলের জিজ্ঞাসুটা এমন ছিল যাতে করে মনে হচ্ছিল, তার কোনো গোপন বিষয়ে কাশেম আজ বিকেলে জেনে গেছে। ধরা পড়ার মত একটা করুণ ভাব সাইদুলের চোখেমুখে। বলনা, আজ বিকেলে কি হয়েছে?

কাশেম বেশ মজাই পাচ্ছে। তবে তার বেশি ভাল লাগছে, সাইদুল কিছুটা হলেও সহজ হয়ে উঠেছে দেখে।

একবার সহজ হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। সাইদুলের কথার মধ্যে একটু যেন দুর্বলতাও ছিল। এবার সে কাশেমের দিকে ঘুরে বসলো, বলনা। বিকেলে কি হলো ?

সে আর বলিস না।

তার মানে? সেটাই তো শুনতে চাচ্ছি।

কাশেম একটু ভাবলো। তারপর বললো, বিকেলে গিয়েছিলাম কাওরান বাজার।

তারপর?

তারপর আর কি! গরমে ঘেমে নেয়ে বাসায় ফিরেছি। বাসায় এসে দেখি কারেন্ট নেই।

সাইদুল ভেবেছিল অন্যকিছু। সে বিরক্তিতে চোখ কুচকিয়ে বললো, ধুর! এটা কি কোনো খবর হলো?

কাশেম হাসলো। তা বটে। তবে এর চেয়েও খবর একটি আছে।

সেটাই আগে বলনা! জানিস তো আমার প্রেসার-এর রোগ আছে।

কাশেম এবার একটু গম্ভীর হলো। শোন, আগে যা কিছু বলেছি তার কোনো অর্থ হয় না। ফালতু, বুঝলি . . .

তাহলে অর্থপূর্ণটায় আগে বলনা।

বলছি। বলে কাশেম আরও একটু অপেক্ষা করলো।

সাইদুল একটু গলা চড়িয়ে বললো, শিউলি, এ ঘরে একটা বাতির ব্যবস্থা করতে হয় যে।

কাশেম অবাক হয়ে বললো, শিউলি? সে আবার কে?

ও শিউলি। শিউলি আমার ভায়ের মেয়ে। ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছে। এবার তোর কথা বল। আমার আর ধৈর্য থাকছে না।

কাশেম হেঁয়ালির সাথে বললো, আমার আবার কথা কোথায়। কথা তো তোরই।

তার মানে?

মানে হলো, আজ বিকেলে তাপসীর সাথে দেখা হলো।

তাপসী? তারপর?

www.pathagar.com

তোর কথা খুব করে জিজ্ঞেস করলো। বারবার, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

তুই কি বললি?

কি আর বলবো। যা জানি তাই বললাম।

রেবার কথাও কি বলেছিস?

রেবার কথা আমার চেয়ে তো সেই বেশি জানে দেখলাম।

আমার ওপর কি তাপসীর কোনো রাগ বা ঘৃণা আছে?

সেটা তো বুঝলাম না। বরং দেখলাম তোর প্রতি সে খুব দুর্বল। বলে কাশেম হেসে উঠলো।

সাইদুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, দুনিয়ার নিয়ম বুঝে ওঠা খুব কঠিন। দেখ, রেবাকে আমি চেয়েছিলাম কিন্তু তাপসী চেয়েছিল আমাকে। কোনোটাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগলো না। তাপসী আমাকে পেলনা, আর আমি রেবাকে পেয়েও রাখতে পারলাম না।

কাশেম একটু নড়ে বসলো। বুঝলি, জীবনটা বড় জটিল। নিক্তির কাঁটায় মেপে জীবন চালানো যায় না।

এসব এখন আমিও ভাবি। তুই-ই বল, আমার কি দোষ? রেবা এক রকম জেদ করেই চলে গেল।

জেদটা কিসের জন্য?

রেবা মনে করে একমাত্র সেই সব কিছু বোঝে। তার চিন্তায়, মতামতে, সব কিছুতে সে একক। তুই-ই বল, এ ধরনের মানসিকতা হলে কি সমাজ-সংসারে মানিয়ে চলা যায়? সে অনেক কথারে। এত সংক্ষেপে বলা যাবে না।

তবুও বলনা, শুনি।

সে না হয় বলবো। তার আগে তুই তাপসীর কথা কিছু বল। ওকে খুব করে মনে পড়ছে।

তাপসীর কথা খুব বেশি কিছু নেই। নতুন খবরের মধ্যে, সে বেশ সুখেই আছে। তবুও সম্ভবত তোর কথা এখনো ভুলতে পারেনি। যাক সে কথা। এখন বল রেবা ভাবী কবে চলে গেছে?

গত মাসে।

মাঝে মাঝে আসে না? কিংবা ফোনে আলাপ হয় না?

না।

এখন কি ভাবছিস?

ভাবছি—

সাইদুলের কথা শেষ না হতেই খুব জোরে দরোজায় কড়া নাড়ানোর শব্দ হলো। সাইদুল এ ঘর থেকে চিৎকার করে বললো, শিউলি, দেখতো মা, কে এলো।

শিউলি দরোজা খুলতেই অভিযোগহীন একটি কণ্ঠ শুনা গেল, কিরে দরোজা খুলতে এত দেরি করলি যে।

শিউলি একটু হাসলো।

www.pathagar.com

শিউলির সাথে দরোজায় খুব আস্তে, খুব ধীরলয়ে এই কথাটুকুর সুবিস্তৃত অর্থ এবং আখ্যানপর্ব খুঁজে পেল সাইদুল। মুহূর্তেই সে সতর্ক হয়ে উঠলো।

কে এলো রে?

প্রশ্নের জবাবে সাইদুল কাশেমের কাছে, আরও কাছে মুখ রেখে ফিস ফিস করে বললো, নারে, গল্পটা আর জমলো না বোধহয়। রেবা ফিরে এসেছে।

কাশেম একগাল বিজয়ীর হাসি হেসে রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বললো, ভাবীর সংসারে ভাবী আসবে না তো কে আসবে রে গাধা! আমি এখন যাই।

ও ঘর থেকে রেবার গলা শুনা গেল, যাবেন মানে? আমি রান্না বসাচ্ছি। খেয়ে দেয়ে তারপর যাবেন।

না ভাবী, আর একদিন। উঠে দাঁড়ালো কাশেম। ততোক্ষণে কারেন্ট চলে এসেছে। এবং তাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে চারপাশ।

যাবার সময় কাশেম সাইদুলকে বললো, জীবনটা এক অসীম সাগর। বুদ্ধি আর কৌশল না জানলে এখানে তরী ডোবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়, বুঝলি।

কিন্তু কাশেম, রেবার ফিরে আসা, —আমার কাছে কেমন যেন ভেলকিবাজির মত মনে হচ্ছে। সম্ভবত তোরই প্রচেষ্টা . . .

ধুর! আমি আর কিইবা করেছি। যা করার সে তো তাপসীই করেছে। কৃতজ্ঞ থাকলে তার কাছে থাকবি। এখন যাইরে। . .

সাইদুল দরোজা লাগিয়ে দিতে দিতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, তাপসী? তাপসী আমার জন্য এমনটি করতে গেল কেন? ভাবনার চতুর্দোলায় কেবলই দুলতে থাকে সাইদুল ইসলাম। ■

www.pathagar.com

কপোতাক্ষর কান্না

এক

'কি হলো, আজ আর গাঙে যাবা না?

সামেত্তভান সানকিতে পান্তা বাড়তে বাড়তে হারানকে বললো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হারান একটু নড়ে বসলো।

পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি মাত্র ঘর। ওপরে বিচালি আর নারকেলের পাতার ছাউনি। কোনো উঠোন নেই। ঘরটুকু বাধার যে জায়গা পেয়েছে এটাই হারানের ভাগ্য।

কপোতাক্ষর ধারে কাসেমের জমির এক কোণায় এই ঘরটি সে গেলবার তুলেছে। এর আগে তার কোনো ঘর ছিল না। কাসেমের বাড়িতে মাইনে খাটতো। সামেত্তভানকে বিয়ে করার পর কাসেমই তাকে ঘর বাধার জন্যে জায়গাটুকু ছেড়ে দিছে।

জীবন জীবিকার জন্যে হারান কপোতাক্ষে জাল বায়। সারাদিন জাল বেয়ে যে কটা মাছ পায় তাই নিয়ে বিকালে চলে যায় বাঁকড়ার হাটে। বেচাবিক্রি করে চাল-তরকারি কিনে ঘরে ফেরে রাতে। যেদিন মাছ ধরতে পারে না, সেদিন হারানের ঘরে চুলাও জ্বলে না। সারারাত তারা দুটো প্রাণী ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করে কাটিয়ে দেয়।

হারানের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কদিন থেকে বুকে ব্যথা করছে। ব্যথার কথা সে সামেত্তকে জানায় না।

গত রাতেও ঘুমুতে পারেনি হারান। খুবই কষ্ট পেয়েছে বুকের ব্যথায়। এর মধ্যে কাশি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যায় না।

সামেত্তর বুকটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। হারান অভয় দেয়, 'কান্দিসনেরে, বউ। গরীবের জান বেজায় শক্ত। এ্যাতো শিগগির মউত হবে না।'

সামেত্ত হারানের মুখ চেপে ধরে, 'আল্লার দোহাই, ও কতা মুকে আনবা না। তুমি মললি আমার কি হবে?'

সামেত্তর চারকুলে কেউ নেই। হারানের হঠাৎ মৃত্যু হলে তার খুব অসুবিধা হবে। তারপরও সামেত্তর কথায় হারানের মন খারাপ হয়ে যায়। 'কি কইসরে বউ! আমার মরণডা তালি কিছুই না? তোর কাছে কোনো কষ্টের না? আমার জান-পরান নে টানাটানি আর তুই কিনা ভাবতিচিস তোর কতা!'

হারানের হাত ধরে সামেত্ত তার বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। 'আমি কি তাই কচ্ছি? তুমি না আমার জানের জান, পরানের পরান! তুমি মললি আমি আর বাঁচি থাকপো কার জন্যি!'

www.pathagar.com

'ও কতা কসনেরে বউ। মউত আসলি ঠ্যাকাবে কিডা? তোর বয়েস আচে। আমি মললি তুই আবার অন্য জাগায় ঘর বান্দিস।'

সামেত্ত আবার হারানের মুখ চেপে ধরে। 'কও আর কোনোদিন ইরাম কতা মুকে আনবানা!'

হারান কাশতে কাশতে ঘরঘরে গলায় বলে, 'ঠিক আচে আর কবো না।'

মুখ থেকে সামেত্তর হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে হারান বললো, 'বউ! তুই সত্যিই আমাকে ভালোবাসিস। কিন্তু কেন্ বাসিস ক দিকি। আমার কি আচে? ঘর নেই। টাকা নেই। তোরে ঠিক মতো খাতি পত্তি দিতে পারিনে।

তারপও। ...'

'হ্যায়। তারপরও তুমাকে আমি ভালোবাসি। কারণ, তুমি যে আমার স্বামী। তুমি যে আমার সব।'

অসুস্থ শরীর। তবুও সামেত্তর কথায় হারানের বুকটা খুশিতে ভরে যায়। সেই খুশিতে দুর্বল শরীরে আরও কাছে টেনে নেয় সামেত্তর লিক লিকে হাড্ডিসার দেহটা।

দুই

পরনের ছেঁড়া লুঙ্গিটা ঠিক করতে করতে হারান উঠে দাঁড়ালো। ওঠার সাথে সাথে তার কাশির বেগটাও বেড়ে গেল। কাশতে কাশতে কুজো হয়ে গেল তার দেহ।

পান্তার সানকিটা হাত থেকে নামিয়ে সামেত্ত দ্রুত হারানকে ধরলো। 'ঠিক আচে, শরীলডা বেশি খারাপ লাগলি আজ আর গাঙে যাবার দরকার নেই।'

বসতে বসতে হারান খুব কষ্টে বললো, 'গাঙে না গেলি খাবো কি?'

'থাক। না খায়ে থাকপো। আগে জীবন না খাওয়া?'

এই হিসাবটাই তো সারা জীবন মেলাতে পারলো না হারান। সেও অনেক ভেবেছে। দুমুঠো খাবারের জন্যে তাদের যে কি প্রাণান্ত কষ্ট করতে হয়! মাঝে মাঝে ঘেন্না ধরে যায় হারানের। ভাবে, এর নাম কি জীবন?

একটু বসে থাকার পর হারান কিছুটা স্বস্তিবোধ করলো। ততোক্ষণে সামেত্ত সানকিতে চুমুক দিয়ে আমানিটুকু শেষ করে ফেলেছে।

কোমরে গামছাটা বেঁধে হারান বললো, 'দেরে, জাল আর খারুইডা পাড়ে দে। দেকি গাঙের দিকে যাই।'

'কলাম না, যাতি হবে না! ঘরে শুয়ে থাকো।'

'শুয়ে থাকলি খাতি দেবে কিডা?'

'গাঙে গেলিওবা কি? গাঙের যা অবস্তা! মাচ কনে? গেল কদিন তো কিছুই পাওনি।'

'ঠিকই কইচিস। গাঙে হাঁটু পানি। কোনো কোনো জাগায় এটটুও নেই। ঠিক তোর শরীলের মতো। একদম শুকুই গেছে। মাচ থাকে কনে? তবু কি আর করা! যাই, চিষ্টা করে দেকি।'

কাঁধে জাল আর হাতে খারুই নিয়ে হারান কপোতাক্ষর দিকে হাঁতে শুরু করে।

www.pathagar.com

তিন

কাঁধে জাল নিয়ে হারান কপোতাক্ষর কোল ঘেঁষে হাঁটছে। কতদূর পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু একটা ক্ষ্যাপ ফেলার মতো সে সুযোগ পায়নি।

কপোতাক্ষ শুকিয়ে গেছে। চৈত্রের টানে তার বুকটা ধুধু করছে। দুপাশে জেগে উঠেছে চর। চাষীরা সেই চর দখল করে ইরি-বোরোর চাষ করছে। ঝির ঝির করে কোনো প্রকার জীবনে বেঁচে আছে কপোতাক্ষ। ঠিক হারানের মতো। হারান ভাবে, এর নাম কি বেঁচে থাকা!

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কপোতাক্ষর স্তূপিন্ডের ওপর দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। অথচ, এই কপোতাক্ষ একসময় কতো বড় ছিল। কি তার নামডাক ছিল। ভাটি অঞ্চল থেকে বড় বড় গহনা নৌকা, লঞ্চ এমন কি সওদাগরি জাহাজও আসতো বঙ্গোপসাগর থেকে। সুন্দরবন থেকে গোলপাতা, মধু, মাছ আরও কত কি বোঝাই করে এই কপোতাক্ষ দিয়ে উজান কেটে কেটে চলে আসতো ব্যবসায়ীরা। সেই কপোতাক্ষ আজ নির্জীব,নিষ্প্রাণ! হারানও ছোটকালে কপোতাক্ষকে দেখেছে। আজও দেখছে। কিন্তু মাঝখানে তার জীবনের মতো রয়ে গেছে ভীষণ এক ব্যবধান। এমন কেন হলো ? জানেনা হারান।

হারান শুনেছে কপোতাক্ষ শুকিয়ে যাবার পেছনে কারণ আছে। একটা মস্তবড় কারণ। কি সেই কারণ? হারান তা বোঝে না। সে কপোতাক্ষর পাঁজরে দাঁড়িয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'হায়রে কপোতাক্ষ! তুই শুকুই গেলি! তুই শুকুই গেলি ক' আমরা কেমন করে বাঁচে থাকপো? কি খায়ে জানডারে বাঁচাবো?'

মাইলের পর মাইল কপোতাক্ষর চর বেয়ে হারান হাঁটে। কিন্তু কাঁধের জাল আর নামাতে পারেনা। তার কাঁধে জাল দেখে উলঙ্গ ছেলে-মেয়েরা গামছা গুটিয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে হারানের দিকে। খিল খিল করে হাসে উপহাস করে তাকে। 'ইসরে! গাঙে পানি নেই, ব্যাটার খ্যাপ ফ্যালানির শক!'

হারানের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। 'আল্লারে দেশটা জাহান্নাম হয়ে গ্যালো নাকি! আর কনে যাবো কও দেকি। আর কত্ত দূরে গেলি পানির দেকা পাবো? মাচ না পালি জীবন বাঁচাবো কেমন করি! ঘরে আমার সামেত্ত কান্দে! তার প্যাটে যে আমার ভবিষ্যৎ।'

হঠাৎ হারানের কাশিটা বেড়ে গেল। কাশতে কাশতে সে কপোতাক্ষর কিনারা ঘেঁষে বসে পড়লো। বুকের ভেতরে ব্যথাটাও আবার বেড়ে গেছে। আর বসতে পারলো না। বুকটা এঁটে ধরে কাঁধে জাল নিয়েই কপোতাক্ষর কাদার ওপর নেতিয়ে পড়লো হারান।

পশ্চিম দিক থেকে এক ঝাঁক শকুন ডানা ঝাপটিয়ে চিৎকার করতে করতে হারানের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। শকুনের চিৎকারে কপোতাক্ষর বুকে এতক্ষণ যেসব দোয়েল, মাছরাঙা ও বকের ঝাঁক কাদা-পানিতে বসেছিল তারাও মুহূর্তে ভয় এবং আতঙ্কে উড়ে গেল দূরে, বহু দূরে।

চোখ খোলার মতো শক্তি নেই হারানের। সে কেবল অনুভব করলো, একটি আর্তবিদারী কান্নার শব্দ। শব্দটি কপোতাক্ষর, নাকি সামেত্তভানের, নাকি তাদের অনাগত শিশুর— হারান তা বুঝে উঠতে পারলো না। ■

www.pathagar.com

মানুষ

এক.

লোকটি পড়েছিল রাস্তার একপাশে।

সিটি করপোরেশনের ম্যানহোলটি তার খুব কাছাকাছি। ম্যানহোলের ঢাকনা না থাকায় সেখান থেকে ক্রমাগত দূর্গন্ধ ছুটছে।

পথচারীরা নাকে রুমাল চেপে রাস্তাটুকু পার হচ্ছে। পথচারীদের চেয়েও তার শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠানামা করছে। খুব দ্রুতগতিতে। তারপরও লোকটির কোনো অনুভূতি নেই দুর্গন্ধের ব্যাপারে।

রাস্তার ওপাশে- যদিও ময়লা ফেলানোর কোনো জায়গা ওটা নয়, তবুও লাইটপোষ্টে নিচে জমে আছে আবর্জনা স্তূপ। আবর্জনার সাথে মিলে মিশে আছে শহরের সভ্য পরিবারের ব্যবহার্য অসভ্য দ্রব্যাদি।

অলিখিত এই ডাষ্টবিনের ওপর এইমাত্র সওয়ার হয়েছে কয়েকটি কাক এবং দুটো কুকুর। কুকুর দুটোর একটি পুরুষ, অপরটি মেয়ে। যদিও তাদের উদ্দেশ্য ডাষ্টবিন থেকে আহার্য সংগ্রহ করা, তবুও কি আশ্চর্য! তারই ফাঁকে ফাঁকে তারা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে মায়াভরা চোখে। যে চোখের চাহনিতে দুলে উঠছে কিছু সংশয়হীন নির্ভরতা, কিছু প্রেম, কিছু ভালবাসা এবং কিছু সমবেদনা।

লোকটি সেদিকে তাকিয়ে আছে, অপলকে। পথচারীরা চলে যাচ্ছে তাকে উপেক্ষা করে।কেউবা তাকে মাড়িয়ে, গালি দিতে দিতে।

কাক কিংবা কুকুরও তাদের স্বজাতিকে এমনভাবে তিরস্কার করেনা।

কিন্তু মানুষ করে। মানুষ পারে। সবই পারে।

কারণ তারা যে মা নু ষ।...

দুই.

রাজধানীর বাণিজ্য এলাকার একটি সওদাগরি অফিস। পাঁচতলার সুসজ্জিত একটি বড় রুমে সে বসে আছে সামনের চেয়ারে। মস্তক টানটান। বুকটা সমুদ্রের মত ফোলানো। চোখদুটো চিতাবাঘের মত জ্বলছে।

চেয়ারম্যান সাহেব তাকে দেখলেন বেশ ভাল করে। তারপর একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পড়ুন।

সে পড়তে থাকলো। এক দুই তিন করে ত্রিশটি ক্রমিক নম্বরসহ সেটি পড়ে শেষ করলো। এবার চেয়ারম্যান সাহেবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আছড়ে পড়লো তার ওপর, আপনার মতামত ব্যক্ত করুন!

মতামত ?

একটু হাসলো চাকরিপ্রার্থী। একটা সাহসী নি:শ্বাস বেরিয়ে এলো তার নাক দিয়ে।

www.pathagar.com

বললো, আপনাদের এই শর্তগুলো তো মধ্যযুগীয় দাসপ্রথাকেও হার মানিয়ে দেয়!

দাসপ্রথা ? হাসালেন আপনি। দাসপ্রথার বাইরে এখনো কোথাও কিছু আছে নাকি? শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা আর অধিকার দিলে- তারা আমাদের পায়ের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকবে কেন? বলতে বলতে চেয়ারম্যান সাহেবের বত্রিশটি নির্মম নিষ্ঠুর দাঁত বেরিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখার পর চাকরিপ্রার্থীর চোখদুটো এবার ভীষণভাবে জ্বলে উঠলো। ঘৃণায় সে তিনবার থুথু ফেললো দামী কার্পেট বিছানো সুনসান রুমের ভেতর।

খেঁকিয়ে উঠলেন চেয়ারম্যান, আরে করেন কি? নোংরা করে দিলেন তো রুমটা!

হ্যা করবো। একশোবার করবো। প্রয়োজনে এখানে বাহ্যি করবো। এবং ...

রুম থেকে বেরিয়ে এলো সে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করলো তার বুকের ভেতর দিয়ে এগারকোটি পঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার কৃতদাসের গলায় এবং কোমরে শেকল বেধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে মাতাল সওদাগর।

সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং তারপর।-

তারপর একটা বজ্রের কোরাস। তারপর একটা দুরন্ত কাল বৈশাখী ঝড়। একটা সাইক্লোন কিংবা তার চেয়েও ভয়ংকর একটা কিছুর সাথে একাকার হয়ে গেল সে। মুহূর্তমাত্র।

তারপর চোখ খুলে দেখলো দাসগুলো শৃংখলমুক্ত। আকাশে ঝির ঝির বাতাস বইছে। একটা প্রশান্ত আবহাওয়ায় হেসে উঠেছে পৃথিবীর বুক। সে খুব দ্রুত পা বাড়ালো। ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে তার।

ঘরের কথা মনে হতেই তার বুকটা আবার কেঁপে উঠলো।

ঘর? আমার তো কোনো ঘর নেই!

তিন.

কথা না থাকলেও তো অনেক কিছু ঘটে যায়।

বিদৌরা কথা রাখেনি তো কি হয়েছে? সোহেলী তো এসেছে। সোহেলী স্বপ্ন দেখতে না জানলেও সন্তান দিতে পারে। শিক্ষিত না হলেও ভাত রাঁধতে জানে। আর কি চাই!

মানুষের তো অনেক কিছুই চাইবার থাকতে পারে। কিন্তু সে চেয়েছিল একটি মাত্র কুঁড়ে ঘর। আর হৃদয়ভরা ভালবাসা।

বিদৌরার প্রত্যাখানে ভালবাসার নদীটা যেন মরে গেছে। খা খা করছে হৃদয়ের সমস্ত চর।

সন্তান উৎপন্ন করা আর অর্থ উপার্জন করা এক কথা নয়। কেউ ভাগ্যের পসরা ঠাঁই দেবার জায়গা পায়না, আবার কেউবা ভাগ্যকে তাড়িয়েও ধরতে পারে না।

সে বসে আছে নদীর কিনারে।

নদীটাও কেমন যেন থেমে গেছে। বাতাসও স্তব্ধ। কেবল একটা শাঁ শাঁ ভয়ংকর শব্দ তার পাঁজর ভেদ করে উড়ে যাচ্ছে শূন্য থেকে মহাশুন্যে। ক্রমাগত।...

সে দেখেছে নদীর ভাঙ্গাগড়া। দেখছে পৃথিবীর ভাঙ্গাগড়া। তার মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। দূরে বহু দূরে। সে চোখ বন্ধ করলো। তার খুব ঘুম পাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করতেই অনুভব করলো- সে পড়ে আছে রাস্তার ওপর। আর তার বুকের

www.pathagar.com

ওপর দিয়ে ঘৃণার থু থু ফেলে হেঁটে যাচ্ছে বীরদর্পে হিংস্র হায়েনার দল। তার পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার খুলি ছিটকে পড়ছে। তার শরীরের রক্ত নিয়ে কলস ভরছে যুবতী মেয়েরা। আর তার হাড় হাড্ডি-চামড়া এবং নাড়িভূড়ি নিয়ে দোকান সাজিয়েছে চতুর কসাই।

একটু আগেও বুঝতে পারেনি সে এতোটা মূল্যবান সম্পদ। তার চোখদুটো হেঁচকা টানে উপড়ে নিয়ে তারা তা বসিয়ে দিতে গেল শোষকের চোখে।

সেই চোখ! যেচোখ দিয়ে তার ক্রমাগত ঝরে গেছে বেদনাশ্রু। শোষণের শিলাবৃষ্টিতে যেচোখ ক্রমাগত কেঁদে গেছে, সেই চোখই এখন কাঁদাবে শোষিত মানুষকে?

ভাবতেই সে লাফিয়ে উঠলো এবং তার বিক্ষুব্ধ চোখ দিয়ে এক পশলা আগুনের বৃষ্টি ঝরলো এবং তারপর।-

তারপর সে চিৎকার করে উঠলো- খামোশ! আমি মা নু ষ!...

চার.

লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে সাহসী ভঙ্গিতে।

কিন্তু অতীত তার কাছে ধূসর হয়ে গেছে।

বর্তমান মেঘে ঢাকা অমাবস্যার রাত।

আর ভবিষ্যত কেবলই ধু ধু অসীম শূন্যতা।

তবুও কি আশ্চার্য!

যখন থেকে লোকটি নিজেকে মানুষ ভাবলো আর তখন থেকেই সে বাঁচতে শুরু করলো।

এখন লোকটি রাস্তা দিয়ে নি:সঙ্গভাবে হাঁটে আর আবৃত্তি করে:

"মানুষ তরঙ্গ হও, মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও, ভেঙ্গে চলো কালের কপাট।"■

www.pathagar.com

অমানুষ

কিছু কিছু কথা আছে, যার শক্তি এতো বেশি যে, হাজার চেষ্টা করেও মন থেকে তা মুছে ফেলা যায় না। প্রেমের বা মধুর মিলনের কথাও মানুষ এক সময় ভুলে যায়, কিন্তু বেদনার কথা ভুলতে পারে না কখনো। কি এক অসম্ভব ধারালো ছুরির মতো সেই কষ্টের স্মৃতির ফলা মানুষের হৃদয়ে বিঁধে যেতে থাকে অবিরত।

অবশ্য সম্পদশালীদের কথা আলাদা। কোনো কষ্ট, অপমান, কিংবা গ্লানি তাদেরকে এতোটুকুও স্পর্শ করতে পারে না। সম্পদশালী হবার প্রথম শর্তই হলো গণ্ডারের মতো অনুভূতির চামড়াকে মোটা ও শক্ত করা। চামার না হলে কেউ সম্পদের পাহাড় গড়তে পারে না। থিওরিটা জেনেছিল সাইফ কর্মজীবনের সেই প্রথমে। এতদিন পরও সাইফের ধারণাটা এতটুকু বদলায়নি। সমাজ ও কাল যেন তাকে উপহাস করে বলে, অতো মান অভিমান আর টনটনে অনুভূতি নিয়ে আর যাই হোক এই চাড়ালের দেশে বাঁচতে পারবে না।

হাসতে হাসতে সাইফ জবাব দেয়, গরীবের সম্পদ বলতে তো আছে মাত্র ঐটুকু। তাও যদি বিকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আর থাকলো কি? আমার ওপর দিয়ে যতো কষ্টের ঝড় বয়ে যাক না কেন, আমি পারবো না। পারবো না ব্যক্তিসত্তা বিলিয়ে দিয়ে, অপমান আর বিবেকের দংশন সহ্য করে উলঙ্গ হবার প্রতিযোগিতায় নামতে। যারা পারে তারা পারে।

তা পারবে কেন? মানুষ হয়ে বাঁচতে কি তোমার কোন সাধ আছে?

মানুষ? কাকে বলে মানুষ? মানুষ হবার সংজ্ঞা কি?

আমিন হেসে বললো, বুঝলি- একেক শ্রেণীর মানুষের কাছে মানুষের একেক রকম সংজ্ঞা আছে। তবে বর্তমান পৃথিবীর কাছে বড় সংজ্ঞা হলো- অর্থ। যার অর্থ আছে, সে যত খারাপ লোকই হোক না কেন তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে। চোখ খুলে দেখ। তুইও এই সত্যকে মানতে বাধ্য হবি। তোর ঐ অর্থহীন মর্যাদাবোধকে কেউ সম্মান দেখাবে না, তা তুই যতো সাচ্চাই হোসনা কেন।

আমিনের কথায় যে যুক্তি নেই তা নয়। তবে ঐ কথার ওপর বিশ্বাস করতে সাইফের মন কখনো রাজী নয়। অর্থের মূল্য পৃথিবীতে আগেও ছিল। এখনো আছে। তাই বলে সম্পদহীন সৎ মানুষের কোনো মর্যাদা থাকবে না এটা কেমন কথা!

আমিনের সাথে আজ দেখা হবার পর থেকেই সাইফ ভাবছে এসব নিয়ে। ভাবছে- মানুষের সংজ্ঞা কি? সম্পদ কিংবা শিক্ষা থাকলেই কি মানুষ মানুষ হতে পারে? ভাবতে ভাবতে সে হাঁটছে।

সাইফ যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, সেই রাস্তাটি রাজধানীর একটি জনবহুল এলাকার পেট ফেঁড়ে চৌরাস্তায় গিয়ে উঠেছে। রাস্তাটি একেতো ছোট, তার ওপর ক্রমাগত মানুষের যাতায়াত। এর ভেতর রিকসা, ভ্যান ও গাড়ীর অত্যাচার। খুব সাবধানে না হাঁটলে যে কোন মুহূর্তে

www.pathagar.com

দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সাইফ একটি রিকসাকে পাশ দেবার জন্যে একটু সরে দাঁড়ালো। তার পেছনে একটি বিশাল বাড়ি। গেট খোলা। গেটের মুখে সে দাঁড়িয়ে। রিকসাটি চলে যাবার পর সাইফ আবার হাঁটা শুরু করলো। দু'পা না বাড়াতেই পেছনের গেটের ভেতর থেকে একটি নতুন গাড়ি শাঁ করে তার পায়ের গোড়ালিকে স্পর্শ করলো। মুহূর্তেই পেছন ফিরে সাইফ বললো, মানুষজন দেখে চালাতে পারেন না?

গাড়ির ভেতর থেকে মাথা বার করে একজন কটমট করে তাকালো। মুখের পাইপটা বাম হাতে চেপে ধরে বললো, কিসের মানুষ? সরেন মিয়া!

সাইফের কোনো জবাবের তোয়াক্কা না করে গাড়ি নিয়ে লোকটি হাওয়ার গতিতে ছুটে চললো সামনের দিকে।

গাড়িতে চড়লে কি রাস্তার মানুষকে আর মানুষ ভাবা যায় না?

অনেক আনন্দের কথা ভুলে গেলেও, অনেক মধুর স্মৃতির কথা ভুলে গেলেও 'কিসের মানুষ' এই ছোট্ট কথাটিকে সাইফ ভুলতে পারে না কখনো। আমৃত্যু তাকে কষ্ট দিয়ে যাবে। যেমন এখনো ভুলতে পারে না অপটিকসের সেই চামারের কথা।

কিছুদিন যাবত চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না সাইফ। ওয়ারলেসের অপর পাশের অপটিকসে গিয়ে ডাক্তারকে চোখ দেখিয়ে চশমার অর্ডার দিল। নির্ধারিত তারিখে চশমা আনতে গেল সাইফ।

অপটিকসের মালিক সাইফের হাতে চশমা দিয়ে গুণে গুণে টাকা নিয়ে নিল। চশমাটা চোখে দেবার পর সাইফ অবাক হলো। এখনতো আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কথাটা দোকানের মালিককে বললো। সাইফের হাত থেকে চশমা এবং প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে সে কয়েকবার দেখলো। তারপর বললো, আমাদের চশমা তৈরিতে ভুল হয়নি। ভুল হয়েছে ডাক্তারের।

তাহলে এটা আবার পাল্টাতে হবে?

হ্যা।

বেশ ঝামেলার ব্যাপার। ডাক্তারের কাছে গিয়ে আবার চোখ দেখাতে হলো। নতুন প্রেসক্রিপশনটা অপটিকসের মালিকের হাতে দিতে দিতে সাইফ বললো, ডাক্তার তো আপনাদেরই নিয়োগ করা। চশমাও দিচ্ছেন আপনারা। মাঝখানে অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেল। আর হয়রানিতো আছেই।

সাইফের কথা তখনো শেষ হয়নি। হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো একটি শব্দ আছড়ে পড়লো সাইফের কানে। দোকানের মালিক বললো, আমরা মানুষ চিনিনে। আমরা চিনি টাকা। আবার টাকা দেন চশমা নেন, ব্যস।

সাইফের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। আপনি বলেন কি? আপনার কাছে মানুষের কোনো মূল্য নেই? টাকাই সব? একটা মানুষের জীবনের মূল্যের চেয়েও কি আপনার এই একজোড়া চশমার মূল্য বেশি?

দোকানের মালিক কেমন অনায়াসেই উত্তর দিল, হ্যা। তাই।

আমরা হয়তো বুঝিনা। আসলে ব্যাটার কথায় সত্যি আছে। ওদের কাছে মানুষের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি।

হতে পারে। কথাটার ভেতর অনেক সত্যি আছে। কিন্তু সাইফ যেন কিছুতেই মানতে

www.pathagar.com

পারছে না। তার বুকের ভেতর একটি কষ্ট কেবলই মোচড় দিয়ে উঠছে। এই সাংঘাতিক ছোট্ট কথাটিকে সে ভুলতে পারছে না। পারবেও না কখনো। আসলে সব কিছুতো ভোলা যায় না। ইচ্ছে করলেও না। আমরা খেয়াল নাও রাখতে পারি যে, একজন নারী যতবড় সুন্দরীই হোকনা কেন, তবু সে নারী। অন্যদের মতো সেও খায় ঘুমায় বাহ্যি করে এবং সন্তান ধারণও করে। এসব তুচ্ছজ্ঞান করার মতো বিষয় বটে। কিন্তু তাই বলে কি জীবনের সকল কিছু ভোলা যায়? নাকি তুচ্ছজ্ঞান করা যায়? অথচ কি আশ্চর্য! ওরা ভুলতে পারে। পর মুহূর্তেই আবার অন্যদের সাথে কথা বলে। হাসে কিংবা খিস্তি খেউড় করে। ওরা পারে। সব পারে। বেশ্যাদের মতো চরিত্র বিক্রি করতে পারে। প্রয়োজনে ধূর্ত মন্ত্রীদের মতো গোঁয়ার কিংবা গাধাও হতে পারে।

আসিফ এখনো ভেবে পায় না এতো হিসেবী মানুষেরা সংসার করে কেমন করে? সংসার করতে গেলেও তো অনেক কিছুই অপচয় করতে হয়। অনেক দিক দিয়ে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সহানুভূতিশীল হতে হয়।

অনুভূতির মাত্রাটা যার যতো বেশি, সে ততো বেশি এই সমাজ সংসারে কষ্ট পায়। এটাই নিয়ম। অনুভূতিহীন মানুষের জন্যে কোনো কষ্ট নেই। কোনো যন্ত্রণা নেই। যেমন নেই পাথরের। কিন্তু পশু পাখি কিংবা কীট পতঙ্গের কষ্ট আছে। কেননা তাদের অনুভূতি আছে। একটি পশু তার স্বজাতিকে পাখি কিংবা অন্য কিছু ভাবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে। মানুষ সবই পারে। একজনের মুখের গ্রাস অন্যে কেড়ে নেয়। মানুষ মানুষকে ঠকায়। প্রতারিত করে। অন্যায়ভাবে অপমান করে সুখ পায়। অন্যকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে তৃপ্তিবোধ করে। কিন্তু পশুরা তা করে না। একটি আহত কাককে ঘিরে অসংখ্য কাকের আহাজারি, একটি আহত কুকুরের জন্যে অন্য কুকুরদের শোক- এ সকল দৃশ্য কেবল অন্য জীবের মধ্যেই আছে। অথচ একজন হিংস্র মানুষ-অন্য মানুষকে সহ্য করতে পারে না। এটা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

অব্যক্ত এক কষ্টের দাবানল বুকে চেপে ধরে আনমনে হাঁটছে সাইফ। তার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি বড় অসহায়, একাকী। নি:সঙ্গ। আমার সাথী বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এতো অনুভূতির বাষ্প নিয়ে কেন পৃথিবীতে এসেছিলাম?

কিছুদূর আসার পর সাইফ দেখলো, একটি ছেলে একাকী দাঁড়িয়ে কেবল নীরবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছে। সাইফ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে?

ছেলেটি সাইফের পায়ে আছড়ে পড়লো। বললো, পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমি একা। এক অফিসে কাজ করতাম। সাহেবের অফিসের কাজ ছাড়াও তার বাসায় কাজ করতে হতো। থাকার জায়গা নেই বলে আমি সাহেবের বাসায় থাকতাম। এক রাতে অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি, আমার চৌকিতে শুয়ে আছে সাহেবের মেয়ে। সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আমি ভয় পেয়ে বিবি সাহেবকে বললাম। বিবি সাহেবতো শুনে গুম মেরে থাকলো। সাহেব রাতে বাসায় ফিরলে সে কি বলেছে তা জানিনে। সকাল না হতেই সাহেব আমাকে ডেকে মারলো। বিবি সাহেব বললো, এসব ছোটলোক কখনো মানুষ হয় নাকি? বাড়ি থেকে বার করে দাও। সাহেব আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে

www.pathagar.com

দিল। বলুন, আমার কি দোষ? কি অপরাধ আমি করেছি? অমানুষের মতো আমিতো সাহেবের মেয়েটিকে ভোগ করতে পারতাম। কেউ তা জানতো না। এভাবে প্রতিদিনই আমি পারতাম। মানুষ বলেইতো আমি এই জঘন্য কাজ করতে পারিনি। অথচ, অমানুষ বলে আমাকে তাড়িয়ে দিল।- বলতে বলতে হু-হু করে কেঁদে ফেললো ছেলেটি।

ওর মাথায় হাত রেখে সাইফ বললো, তোর নাম কিরে?

কালাম। আবুল কালাম।

সাইফ বললো, দু:খ করিসনে কালাম। পৃথিবীটা এমনি।

কেমন? কালামের চোখে মুখে বিস্ময়।

এই যেমনটা তুই অনুভব করছিস, ঠিক তেমনি। চল্।

কোথায় ?

এখন আমার বাসায় যাবি। আজকের রাত অন্তত থাক। কাল অন্য কোথাও যাস।

কাল আবার কোথায় যাবো?

এতোবড় পৃথিবী। কোথাও না কোথাও তোর জায়গা হয়ে যাবে। কারুর জন্যে কেউ আটকে থাকে না। কিছুও আটকে যায় না। এটাও পৃথিবীর নিয়ম।

কালামকে সাথে নিয়ে বাসায় ফিরতেই তোহুরা বললো, তোমার শ্যামল স্যার খবর পাঠিয়েছেন। দেখা করে এসো।

এখনি ?

তা যাওনা। কি জন্যে ডেকেছেন, জেনে এসো। খুব জরুরী নাকি।

শ্যামল স্যার মানে অধ্যাপক হাবীব। ঘোর নাস্তিক। তার আব্বা ছিলেন হাজী। মারা গেছেন। নাস্তিক বলে পিতার দেয়া আস্তিক নামটিও তিনি বদলে শ্যামল রেখেছেন। মিটিং মিছিল আর বিবৃতিতে এখন শ্যামল নামটিই ব্যবহার করেন। শ্যামল সাইফের শিক্ষক। সাইফ তাকে পছন্দ না করলেও অধ্যাপক সাহেব তাকে খুব পছন্দ করেন। কি জন্যে ডেকেছেন জানার জন্যে সাইফ আবার বার হয়ে গেল। কালামকে বললো, তুমি বসো। আমি আসছি।

রাস্তায় নেমে সাইফ সাতপাঁচ অনেক কিছু ভাবছে। কি জন্যে ডেকেছেন তিনি? হিসেবী মানুষ শ্যামল সাহেব। বিয়েশাদী করেননি। একাকী থাকেন। অন্য আর এক নাস্তিকের বাসায় একাকী থাকেন। ভাড়া দেন কিনা জানেনা সাইফ। অপরিচ্ছন্ন পোশাক, ভূতের মতো চুল গোঁফ আর দাড়িতে তাকে বনমানুষের চেয়েও বিশ্রী দেখায়।

সাইফ একটু দ্রুত হেঁটে গন্তব্যে পৌছুলো। পাঁচতলা বাড়ি। শ্যামল সাহেব থাকেন তিন তলায়। গেট খোলা। সাইফ সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেল। তিনতলায় উঠে দেখলো শ্যামল সাহেবের ঘরের দরোজাটা খোলা। ভেতরে লাইট জ্বলছে। ফ্যান চলছে শাঁ শাঁ গতিতে। কথার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। দরোজার ভেতর প্রবেশ করবে কি করবে না— ভাবতেই সাইফের কানে শব্দ এলো। শ্যামল সাহেব বলছেন, আমার সাফকথা। তুই এখান থেকে, এই মহল্লা ছেড়ে আজই চলে যাবি। ফেলতে যতো টাকা লাগে দেব। কিন্তু ব্যাপারটি যেন কেউ না জানে। ভদ্র মানুষ হিসেবে সমাজে আমার নাম আছে। তোর

www.pathagar.com

মতো একজন ছোট লোকের জন্যে যেন আমার বদনাম না হয়।

এবার অন্য আর একটি কণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠটি একটি মেয়ের। বাতাসী। কাজ করে এখানে। বাতাসী গর্জে উঠলো। জোর করে আমার ইজ্জত নে খেলা কল্লেন। আমার প্যাটে দেবতা ঢুকাই দেলেন। আর একোন কচ্চেন আমি ছোট নোক? সুহাগ করার সুমায়তো ক' ., বাতাসী ভাবিসনে। তোরে আমি বে করবো। কই করেন একোন। ফালাতে কচ্ছেন ক্যানো? আমি প্যাটের দেবতাকে ফ্যালাবোনা। মরে গেলিওনা।

শ্যামল সাহেব বললেন, শোন বাতাসী, ঝোঁকের মাথায় মানুষ অনেক কিছু বলে যা সাত্যি না। বিয়ে-টিয়ে আবার কি? ওসব আমিতো মানিনে। তুই যা। ঝামেলা বাধাসনে। তোকে তো টাকা দিচ্ছি। ভাবছিস কেন?

বাতাসী এবার চিৎকার করে উঠলো। রাখেন আপনার টাকা। আমি কি দেহের ব্যবসা করি? অই টাকায় আমি মুতে দি। মুচির মায়ে হলি কি হবে? আমারও ইজ্জত আচে। নরকের ভয় আচে। কাল সকালেই দেকতি পাবেন কে অমানুষ আর কে ছোট নোক। আপনি নাকি ভগবান মানেন না? কিন্তু আমিতো মানি। এবার দেকপেন আমার ভগবানের কি তেজ। হ্যা দেকপেন। বলতে বলতে বাতাসী ঘর থেকে বের হতে গেল।

শ্যামল সাহেব বাতাসীর হাত এঁটে ধরে অনুনয় করে বললো, বাতাসী তুই খুব ভাল মেয়ে। যা বলি শোন। আমাকে ডুবিয়ে তোর কি লাভ বল দেখি। আমি খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবো। বদলী হয়ে গেছি অন্য জায়গায়। নে, এই টাকাগুলো রাখ।

বাতাসী তিনবার থুথু ফেলে এবার ডাকিনীর মতো হুংকার দিয়ে উঠলো। বা! নাস্তিকরা বোদয় এরকম হয়? ইকেন থেকে অন্যখানে গে আবার কোন্ বাতাসীর সব্বোনাশ করবেন? বেশ আচেন। ভগবান না মানে, আইন না মানে কালির ষাঁড়ের মতোন ছুটে বেড়াবেন আর দ্যাশের মায়েগের ইজ্জত মারবেন— তাতো হয়না। ইবার হিসেবের পালা। হিসেব নিকেষ শেষ না করে আর ছাড়ে দিচ্চিনে।

বাতাসীর কথা শেষ না হতেই ঘরের ভেতর একটা ভয়ংকর শব্দ আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল ঘরের চারদিকে।

অধ্যাপক শ্যামল যেন কয়েকবার ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন। তারপর নি:শব্দ। তারপর?

তারপর ঐ ঘরে আর কি ঘটেছিল সাইফ তা জানে না। এখানে দাঁড়ানো আর ঠিক নয় ভেবে সে ঘুরে দাঁড়ালো। দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন সাইফ রাস্তায় নেমেছে, তখন মার্তৃগর্ভের মতো একটা গাঢ়, আঠালো অন্ধকারে গ্রাস করে ফেলেছে ঢাকা শহরটিকে। সম্ভবত গোটা বাংলাদেশকেও।

আজ নববর্ষ।

নববর্ষের এই সাত সকালে দৈনিক সংবাদপত্রে সাইফ আরও একটি মৃত্যুর সংবাদ পড়লো। 'কমরেড শ্যামল দেহত্যাগ করেছেন।'

মৃত্যুটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা-সাইফ তা বুঝে উঠতে পারলো না।

www.pathagar.com

মন-ময়ূরীর ডাক

সময়টা যেন উল্টো বয়ে যাচ্ছে। কী ভাষণ উত্তপ্ত সময়! আবার কখনো বা মনে হয়, সময়টা পাথরের মত অনড়। চেপে আছে বুকের ওপর।

কেন এমন হয়? প্রশ্নটি ঘড়ির কাঁটার মত বারবার ঘুরে আসে ফয়সলের চোখের ওপর। কিন্তু এর জবাব সে জানে না।

শীত আসি আসি করেও যেন আর আসছে না। নামে শীতকাল। কিন্তু শীতের কোনো দেখা নেই। খুব সকাল থেকে আকাশটা বড় কোম্পানীর এমডির মত খুব ভারি এবং গম্ভীর হয়ে আছে। মাঝে মাঝে এলোমেলো বাতাসও বয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, এটা বর্ষার অগ্রিম সংবাদ। আর এ সময়ে বর্ষা মানেই শীতের আগমন।

শীতের জন্য ফয়সলের কোনো তাড়া নেই। নেই তার জন্য কোনো প্রস্তুতি। শহরের অন্যান্য যান্ত্রিক মানুষের মত মওসুম কিংবা ঋতু নিয়েও তার কোনো ভাবনা নেই। মোটেও যে কখনো ছিল না, তা নয়। এইতো ক'বছর আগেও, শহরে আসার পূর্ব পর্যন্ত ঋতু নিয়ে কত কৌতূহল ছিল তার মধ্যে। বসন্ত এলেই জোছনা রাতে, শেষরাত পর্যন্ত মাঠের রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছে। ফিরফিরে হাওয়া। গাছের শাখায় আনন্দকম্পন, হঠাৎ পাতার আড়ালে ডেকে ওঠা পাখির ডাক, ধারে কাছে খেজুর বাগান থেকে শিয়ালের চিৎকার— সে এক স্মৃতি বটে। ফয়সলের মনে পড়ে, বর্ষার সময়ে কাদা-পানিতে মাখামাখি করে সারা শরীর ভিজিয়ে উঠোনে পা দিতেই মা রেগেমেগে আগুন হয়ে উঠতেন। কী দস্যি ছেলেরা, বাব্বা! কত করে বললাম বাদলায় ভিজিসনে। শরীর খারাপ করবে। কে শোনে কার কথা। এখন অসুখ-বিসুখ বাধলে কি করবি শুনি?

অভাবের সংসার। মায়ের আশংকা তাই অন্যখানে। নিশ্চয়ই অমূলক নয়। কিন্তু ফয়সলের মনে তখন অন্যরকম এক আনন্দ। অন্য রকম এক শিহরণ।

ভরা শ্রাবণ। দুদিন থেকে একটানা বৃষ্টি। ঘরে কোনো খাবারের ব্যবস্থা নেই। আই এ পরীক্ষা শেষ করে ফয়সল যখন উঠোনে পা রাখলো, তখন আয়েশা বেগমের এক চোখে আনন্দ আর অন্য চোখে কান্নার ঢল। একমাত্র ছেলে তার পরীক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরেছে। মায়ের খুশির কোনো সীমা নেই। কিন্তু এত যে আদরের ছেলে, তাকে এই পোড়া অভাবের সময়ে খাওয়াবে কি? একমাত্র মায়েরাই বোঝেন, অভুক্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকানো কতটা কষ্টের ব্যাপারে।

ফয়সল জানে তার মায়ের কী কষ্ট। উঠোনে পা রাখতেই সে বুঝতে পারে, মা তার, জনম দুখিনী মা কত কষ্টে দিনযাপন করছেন। কিন্তু সেই বা কি করতে পারে? আকাশে তখনো মেঘ। তখনো বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম ধারায়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। দুদিন ধরে আকাশে না দেখা গেছে সূর্য, না দেখা গেছে তারা। সন্ধ্যার দিকে মাথায় একটা গামছা ফেলে ফয়সল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

www.pathagar.com

টাকার সন্ধানে। ফিরলো অনেক রাতে। হাতে কিছু চালডাল। এভাবে ধার-দেনা করে আর কদিনই বা চলা যাবে? মায়ের চোখে করুণ জিজ্ঞাসা। মায়ের ভাজপড়া কপালের দিকে তাকিয়ে ফয়সল কোনো জবাব খুঁজে পায় না। কেবল একটা নীরব কান্নার ঢেউ কুণ্ডলী পাকিয়ে তার গলার কাছে এসে আটকে থাকে।

আইএ পাস করার পর সে পা রেখেছে রাজধানীতে। উদ্দেশ্য ছিল লেখা-পড়া এবং সেই সাথে মায়ের জন্য কিছু করা।

মানুষের আশার কোনো শেষ নেই। আশা আছে বলেই তো দুখী মানুষগুলো এখনো বেঁচে আছে।

ফয়সলের বেশি কিছু চাইবার ছিল না। লেখা-পড়া চালিয়ে নেবার মত কোনো রকম একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে সে খুশি। তারপর দুএকটা টিউশনী করে যা পাবে তাতেই তার হয়ে যাবে।

থাকার এবং ভর্তির ব্যবস্থা একভাবে যখন হয়ে গেল, তখন ফয়সলের বুক থেকে যেন ভারী পাথরখণ্ডটি ধীরে ধীরে নেমে গেল। কিন্তু ক'দিন পরেই আবার সে চিন্তিত হয়ে উঠলো মায়ের দুর্দশার কথা মনে করে। এমন মা— যার চারকূলে ফয়সল ছাড়া আর কেউ নেই।

তবুও আল্লার শুকরিয়া। গত মাসে দুটি টিউশনী সে পেয়েছে। কৃতজ্ঞতায় ফয়সলের চোখদুটো ভিজে আসে। ভাবে এখান থেকে কিছু হলেও অন্তত মাকে সে পাঠাতে পারবে।

দুঃসময় যখন আসে, তখন সে একা আসে না। এক মাস পূর্ণ হতেই একটি টিউশনী তাকে ছাড়তে হলো। কেন ছাড়তে হলো, সেও এক ইতিহাস বটে। বন্ধুরা শুনে তো অবাক। এমন একটা সুযোগ তুই হাতছাড়া করলি? জানিস এতে তোর ভাগ্য ফিরে যেতে পারতো!

- পারতো। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

- কেন সম্ভব নয়? এমনটি এখানে অহরহ ঘটছে। একটু ছাড় দিলে কিই বা এমন ক্ষতি হতো?

- হতো। ওটা তোরা বুঝবি না।

- তাহলে বুঝিয়ে বল।

- না তাও পারবো না। কারণ এসব নিয়ে কথা বলতেও আমার রুচিতে বাধে।

ফয়সলের জবাব শুনে বন্ধুরা হতবাক।

বন্ধুরা হতবাক হলেও ফয়সল তার সিদ্ধান্তে অনড়। না, কিছুতেই নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত কোনো কাজে সে নিজেকে জড়াবে না। অভাব আছে সত্যি। মায়ের কষ্ট আছে তাও সত্যি। কিন্তু ফয়সল জানে, অভাবের কষ্টের চেয়েও মা বেশি কষ্ট পাবেন তার ছেলের পদস্খলনের কথা জেনে। যতকিছুই হোক, মায়ের মনে কষ্ট দেয়া সম্ভব নয়।

একটি টিউশনী গেছে। একটি আছে। ফয়সল ভাবে, কোনো রকম আর একটি টিউশনী জুটিয়ে নিতে পারলেই হবে। তবে মেয়ে পড়ানো কাজ আমার দিয়ে আর হবে না।

হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ফয়সল ভাবলো, টিউশনীতে যেতে এখনো তো কিছুটা সময় বাকী আছে। প্রায় এক ঘন্টার মত। আকাশে শুমোট অবস্থা। এখন কোথায় গিয়ে সময়টা

www.pathagar.com

কাটানো যায়। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে পাবলিক লাইব্রেরীর দিকেই অগ্রসর হলো।

পাবলিক লাইব্রেরীর চত্বরে পা রাখতেই তার কানে ভেসে এলো, এই যে ফয়সল, এদিকে আয়।

ফয়সল ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো করিম অন্য এক ভদ্রলোকের সাথে বসে কথা বলছে। হাত ইশারায় তাকে কাছে ডাকলো।

ফয়সল সেখানে পৌঁছুতেই করিম পাশের ভদ্রলোকটির সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি হলেন ছমির সাহেব। ব্যবসা করেন। আমার খুব ঘনিষ্ঠ। আর এ হলো ফয়সল। আমরা একসাথে পড়ি। খুব ভাল ছাত্র। বলতে বলতে করিম ফয়সলের হাত ধরে বসতে বললো।

ছমির সাহেবের চেহারাটি বেশ ভদ্র লোকের মত। বললেন, তা আপনি লেখাপড়ার অবসরে আর কি করেন?

করিমই জবাবটা দিল, টিউশনী করে। বেশ সমস্যায় আছে।

- কি ধরনের সমস্যা? ছমির সাহেব জানতে চাইলেন।

- অর্থনৈতিকটাই প্রধান। করিম বললো।

- অর্থনৈতিক? ছমির সাহেবের চোখদুটো যেন হঠাৎ করে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তিনি এবার খুব মনোযোগের সাথে ফয়সলকে দেখলেন। কি দেখলেন? বিষয়টি একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারলেন না। হু! বলে ছমির সাহেব হঠাৎ একটা লম্বা দম ছাড়লেন। বললেন, আপত্তি না থাকলে চলুন। আমরা একসাথে একটু চা খাই।

করিমও প্রস্তাবে রাজি হলো। ফয়সল বললো, না থাক। আমি চা খাই না। তার চেয়ে আপনারা যান। আমি লাইব্রেরীতে একটু পড়াশুনা করবো।

ছমির সাহেব কেমন সরল মানুষের মত বললেন, ঠিক আছে, তাই হোক। তবে আপনার সাথে আমার আর একবার দেখা হওয়া দরকার।

ফয়সল জিজ্ঞেস করলো, কেন?

ছমির সাহেব হেসে বললেন, বাহ! আজ পরিচিত হলাম। এরপর কি দেখা হওয়াটা উচিত নয়?

- তা বটে। তবুও.... ফয়সলের কথা শেষ না হতেই ছমির সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝলেন, আমি জানি অর্থকষ্ট কতটা ভয়ংকর। নিজেকে মানুষ ভাবতে ভুলিয়ে দেয় একমাত্র অভাব। যাকগে, আমি আপনার সাথে এ ব্যাপারে পরে কথা বলবো। দেখি কি করা যায়।

আশ্বাস পেয়ে করিম বললো, সত্যিই ভাই, যদি ওর জন্য কিছু করতে পারেন তাহলে খুবই ভাল হয়। বেচারা বড় দু:খী। আপনি আবার কবে দেখা করবেন?

- তা দু'একদিনের মধ্যে।

- ওভাবে বললে তো আর হবে না। ওর পড়াশুনা আছে। টিউশনী আছে। নির্দিষ্ট একটি সময় দিন।

ছমির সাহেব একটু ভেবে তারপর বললেন, ঠিক আছে আগামী মঙ্গলবার, ঠিক তিনটায় এখানে আসবেন।

মঙ্গলবার। রাত থেকেই ফয়সলের মাথার মধ্যে হাজার রকম চিন্তা-ভাবনা পিলপিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোক আমার ব্যাপারে এতটা উৎসাহী কেন? মানুষ এবং

www.pathagar.com

মানবতা সম্পর্কে আমি যখন রীতিমত হতাশ, ঠিক সেই সময়ে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলাম, যিনি আমার আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন। তিনি আমার জন্য কি করবেন? চাকরি দেবেন, নাকি আবার কোনো উচ্ছৃংখল পারুকে পড়াবার প্রস্তাব দেবেন!

রাত দীর্ঘ থেকে আরও দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু ফয়সলের চোখে কোনো ঘুম নেই। বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মায়ের ছবি। আজ বিকেলেই পেয়েছে মায়ের চিঠি। তার অভাবের কথা, কষ্টের কথা চিঠিতে কিছুই নেই। আছে কেবল ছেলের ভাল থাকার কথা। তার মানুষ হবার কথা। বড় হবার কথা। মায়ের নিজের সম্পর্কে কোনো কথা লেখা না থাকলেও ফয়সল পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তার মা, পঞ্চাশোর্ধ মা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখের দৃষ্টিতে জ্বল জ্বল করছে অসংখ্য প্রত্যাশা এবং স্বপ্ন। মায়ের পরনে আধময়লা ছেঁড়া তালি দেয়া শাড়ি। গায়ের জামাটা ততোধিক ছেঁড়া-ফাটা। হাড় জিরজিরে রোগগ্রস্ত শরীর। গায়ের চামড়া কুচকে গেছে। আহ! কতদিন মায়ের চুলে তেল জোটেনি। সারাদিন খাননি মা। কেমন কাঁপছে তার শরীর। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছেন না।...

মায়ের চিঠিটা ভেজা চোখের ওপর রেখে ফয়সল ডুকরে কেঁদে উঠলো, মাগো! আমিই কি তোমার যত কষ্টের কারণ? আমাকে নিয়ে তুমি এত অলীক স্বপ্ন দেখতে গেলে কেন মা? দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে শিক্ষিত-বেকার। এত বেকারের ভিড়ে আমি তোমার কোন্ স্বপ্নটি সত্যি করে তুলতে সক্ষম হবো, বলো মা!

একটু পরেই তার মনে পড়লো ছমির সাহেবের কথা। বেশ সুন্দর ভদ্র চেহারার সেই লোকটি। যে তাকে যেতে বলেছেন মঙ্গলবার বিকেলে। তার উচ্চারণের মধ্যে কোথাও যেন একটা আশা, একটা ভরসার ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। মনে মনে ফয়সল কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠছে নাকি!

নির্ধারিত সময়ে ফয়সল পাবলিক লাইব্রেরীর চত্বরে গিয়ে পৌছুলো। আশ্চর্য! লোকটি তার আগেই এসে গেছে। তাকে দেখে হেসে বললেন, আসুন। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সালাম দিয়ে ফয়সল বললো, কখন এসেছেন?

- এইতো এলাম। তারপর বলুন, আপনার খবর কী?

একটু হেসে ফয়সল বললো, আমাদের আবার খবর! এই আছি একরকম।

- না, ওভাবে বললে আমি কিন্তু কষ্ট পাবো।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে এমন একটা জাদু আছে, যার সাথে আন্তরিকতাও ফুটে উঠছে। ফয়সল অবাক হচ্ছে তার কথায়। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা আপনার বাড়িতে আর কে কে আছেন?

- আমার মা ছাড়া আর কেউ নেই।

- আব্বা?

- আমার জন্মের পরপরই আব্বা মারা গেছেন। আব্বা বলুন, আর যার যাই বলুন মা-ই আমার সব।

- তাকে দেখাশুনা কে করেন?

- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আর কিছুই নেই। বলতে বলতে ফয়সলের গলাটা ধরে এলো।

www.pathagar.com

ছমির সাহেব বললেন, অবশ্য এতটা অভাব থাকা উচিত নয়, যাতে করে দুর্বল চিত্ত কুফরের দিকে ঠেলে দেয়।

- কী আর করবো বলুন! শত চেষ্টা করেও আমি মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিনে। যে ডাল ধরি, সে ডালই ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ফয়সলের কণ্ঠে হতাশার সুর।

ছমির সাহেব দৃঢ়তার সাথে বললেন, হতাশ হবেন না। আপনি শিক্ষিত এবং বেশ কাজের ছেলে। আমার বিশ্বাস আপনি ইচ্ছে করলে, আপনার এই দুরবস্থা মুহূর্তেই কেটে যেতে পারে এবং সেটা খুবই সম্ভব।

- কীভাবে? ফয়সল ছমিরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

ছমির সাহেব বললেন, আমি আপনাকে পথ দেখাবো। কিন্তু শর্ত হলো, আমি যেভাবে, যেদিকে হাঁটতে বলবো, আপনি বিনা প্রশ্নে সেদিকেই হাঁটবেন।

- যেমন

- যেমন ধরুন, আপনাকে আমি দুই লক্ষ টাকা দেব। ভেবে দেখুন, দুই লক্ষ টাকা। ক্যাশ। কী, স্বপ্ন মনে হচ্ছে? স্বপ্ন নয়, ভাবুন সত্যিই দেব।

- দুই লক্ষ টাকা? আমাকে? আমাকে কেন আপনি এত টাকা দেবেন?

- দেব, মানে আপনি যদি নেন।

- কি জন্য দেবেন? কেন দেবেন?

- না-না, দান কিংবা ঋণ নয়। বিনিময়।

- সেটা কীরকম?

- এই যেমন ধরুন, দুই লক্ষ টাকার জন্য আপনি আমাকে চার কপি রঙিন ছবি দেবেন। আপনার সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

- ছবি? ছবি দিয়ে আপনি কি করবেন?

- কি করবো, সেটাই তো কথা। ছবি কি আছে? না থাকলে আজই উঠিয়ে ফেলুন। এই নিন ছবি ওঠানোর টাকা। কথাটা বলেই তিনি কোটের ভেতরের পকেট থেকে একমুঠো পাঁচশ' টাকার নোট বার করলেন। তার সাথে রয়েছে আরও এক বাণ্ডিল একশ' টাকার নোট। সেখান থেকে একটি একশ' টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, ধরুন।

ফয়সল রীতিমত ঘাবড়ে গেল। এ কি! এত টাকা? তার ছবি ওঠাতেও তিনি টাকা দিতে চান? এই ছবি দিয়ে তিনি কি করবেন? দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে চারকপি ছবি! ফয়সল কেমন যেন বোকা হয়ে গেল। তার কাছে সবকিছুই অবিশ্বাস্য এক জাদুর মত মনে হচ্ছে। সে ঘাবড়ে গেছে অনেকটা। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, শুধু ছবির জন্য আপনি আমাকে এত টাকা দেবেন?

- না, শুধু ছবির জন্য নয়।

- তবে?

- আপনি ছবি দিলে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার পাসপোর্ট করে দেব। ভয় নেই, আপনাকে কিছু করতে হবে না।

- তারপর ?

www.pathagar.com

- তারপর জাপানে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আমি চেষ্টা করবো এবং তার জন্য যা যা করতে হয়, আমি তা করবো। আপনি শুধু করবেন–

- কী করবো ?

- সেটা হলো, আমি যেদিন বলবো, সেদিন ভিসার জন্য লাইনে দাঁড়াবেন এবং আমি যা শিখিয়ে দেব, আপনি কেবল তাই সেখানে বলবেন, ব্যস।

- তারপর?

- তারপর? ছমির সাহেব একটু হাসলেন। বললেন, তারপর, আপনার পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে জাপানে চলে যাবে অন্য কেউ। আপনি জায়গার মানুষ জায়গায় থাকবেন। যাবে কেবল আপনার ছবি ও ভিসা। বলে আর একবার হাসলেন তিনি।

- এতে আপনার লাভ?

- লাভ না হলে কি আর এমন ব্যবসা করা যায়? ভেবেছেন দুই লক্ষ টাকা খাটাবো এমনিতেই? যাকে পাঠাবো, তার কাছ থেকে সুদে-আসলে সব উসুল করে নেব না? সে যাকগে, আমার ব্যাপারটি আমি দেখবো। আপনি আমার কথায় রাজি কিনা আগে বলুন। তবে হ্যা, একথা যেন পৃথিবীর আর কেউ না জানে।

ছমিরের কথা শেষ না হতেই ফয়সল বললো, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। কিছু মনে না করলে, আমি এখন উঠতে চাই।

বেশ রহস্যপূর্ণ হাসি দিয়ে ছমির বললেন, ঠিক আছে যান। আমারও তাড়া আছে। তবে আমার প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন। দুই লক্ষ টাকা।...

উঠতে উঠতে ফয়সল বললো, ঠিক আছে ভাবতে দোষ কি?

- কবে দেখা করবো ?

ফয়সল কয়েক পা এগিয়ে পিছনে ফিরলো। বললো, প্রয়োজন হলে আমিই আপনাকে জানাবো।

কথাটি বলার পর তিনবার থুথু ফেলে ফয়সল সামনে এগুতে থাকলো। তার মাথার ওপর আকাশ। আজও মেঘাচ্ছন্ন। মেঘাচ্ছন্ন হলেও ওটা আকাশ। বৃষ্টি নামলে পৃথিবীর অনেক উপকার হয়। কিন্তু মানুষ যদি লোভ, পাপ আর অন্যায়ের মেঘে আচ্ছন্ন হয় তাহলে তার পরিণাম? ফয়সল আর ভাবতে পারে না।

ডানে মায়ের বিধ্বস্ত একটি করুণ মুখ। আর বামে দুই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ বিত্ত-বৈভবের হাতছানি। কোন দিকে যাবে ফয়সল ?

ফয়সল হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করলো, দুই লক্ষ টাকার প্রতিটি নোট যেন এক-একটি অজগরে রূপ নিচ্ছে এবং তারা ক্রমান্বয়ে ফনা তুলে তেড়ে আসছে তার দিকে। ফয়সল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মা-মা বলে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

ফয়সলের ভয়তাড়িত আর্তচিৎকারের সাথে সাথে মেঘের ওপার থেকে শীতের আকাশটিও যেন কেমন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ফয়সলের দৃঢ় বিশ্বাস, মেঘের ওপারে একটি বিশাল আকাশ আছে। আর আছে সেই আকাশে, একটি চমৎকার সূর্য।

ফয়সল পরিষ্কার যেন শুনতে পাচ্ছে একটি মন-ময়ুরীর স্বপ্নাচ্ছন্ন দূরাগত ডাক।■

www.pathagar.com

ডুবসাঁতার

অন্ধকারটা আরো ঘন হয়ে এলো।

লতিফা হারিকেনের চিমন পরিষ্কার করতে করতে গলা ছেড়ে রোকেয়াকে ডাক দিলেন কয়েকবার।

রোকেয়ার কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে এবার তিনি নিজেই উঠলেন। হারিকেনে কেরোসিন ভরে তারপর সেটা জ্বালিয়ে পেছনের বারান্দায় চলে এলেন।

আফজালুর রহমান তখনো শুয়ে আছেন। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে হেমন্তের গাঢ় কুয়াশা। মাঠের পাশেই তাদের বাড়ি। তিন দিকে ছোট ছোট বিল। দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী মাঠ। মাঠে ক্ষেতভরা ফসল। ঘন গাছগাছালিশ হেমন্তের কুয়াশায় মাঠটিকে সাদা বরফের একটি মস্তবড় পর্বত বলে মনে হচ্ছে। সেই পর্বত দিয়ে যেন ভাতের বলক দেয়া ভাপ বার হচ্ছে এবং তা ক্রমশ দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

আফজাল অপলকে তাকিয়ে আছেন মাঠের দিকে। একটা হিম শিরশির শীতল হাওয়া তার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। তিনি কয়েকবার পাশ ফেরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এবার পাদুটো ভেঙ্গে প্রায় থুতনির কাছে আনলেন। হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার আফজালের মুখটা ভিন্ন কোনো বর্ণের সৃষ্টি করতে পারলো না। বরং ধূসর বর্ণের পাশাপাশি আর একটা ফ্যাকাসে হলুদ এসে তার সমগ্র চেহারাকে আরো বিবর্ণ করে তুলেছে।

হারিকেনটা বারান্দায় রাখতে রাখতে লতিফা বললেন, এখন কি একটু উঠে বসবেন?

আফজাল কোনো উত্তর দিলেন না।

লতিফা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

আফজাল এবার ঠোঁট নেড়ে কি যেন বললেন। তার কথাগুলো ইদানীং তেমন কেউ আর বুঝতে পারে না। এমনকি একমাত্র কন্যা রোকেয়াও। কিন্তু লতিফা ঠিক ঠিক বুঝে যান। বুঝতে পারেন আফজালের অসমাপ্ত কথামালার স্বরধ্বনি। বুঝতে পারেন তার সকল ইশারা ইঙ্গিত। যেমন আফজালের এখনকার উত্তরে লতিফা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তিনি উঠবেন না। তার খুব শীত করছে। গায়ে একটা কাঁথা দিয়ে দিলে ভালো হয়।

লতিফা আফজালের মাথার বালিশটা ঠিক করে দিলেন। তারপর শরীরের ওপর একটা কাঁথা টেনে দিয়ে পেছনে ফিরলেন।

আফজাল আবার চড়ুইয়ের মতো চিঁউ চিঁউ করে কি যেন বললেন। তার অসমাপ্ত শব্দটির অর্থও বুঝে গেলেন লতিফা। তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, রোকেয়া এখনো বাসায় ফেরেনি। হাঁস-মুরগী, ছাগলগুলো সমানে চিৎকার করছে। এদেরকে কোঠায় তুলে দিয়ে আবার আসবো। একটু অপেক্ষা করুন। পান বাটতেও তো সময় লাগবে, নিয়ে আসছি। বলতে বলতে লতিফা চলে গেলেন বাড়ির ভেতর।

www.pathagar.com

আফজাল কাঁথাটা গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে মাথাটা ডান দিকে কাত করে। শুয়ে আছেন। তিনি নিঃশব্দে দেখছেন শব্দমুখর রাস্তা, পাড়ার কোলাহল। দেখছেন মাঠের ধোঁয়াটে চেহারা। আজ কি অমাবস্যা? কথাটা লতিফাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলো তার। কিন্তু লতিফা তো আর এখানে নেই। তিনি অপলকে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। একটি কুকুর অন্ধকারের দেয়াল টপকে পাশের বাড়ির গলি দিয়ে এইমাত্র বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

এই বাড়ির কুকুর। ওসমান ওকে নিয়ে এসেছিল কামার পাড়া থেকে। সেও অনেকদিন আগে। আদর করে ওসমান কুকুরটি নাম রেখেছিল বেড়ে। এই বেড়েকে দিয়ে সে মাঠের কাঠবিড়ালী আর ইঁদুর মেরে সাফ করে দিতো। বেড়ে ছিলো খুবই শিকারী। দৌড়াতে পারতো যেমন-তেমনি ছিল তার শরীরের শক্তি।

এখনকার এই কুকুরটিকে দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এই বেড়েই ছিল সেদিনকার সেই রাগী তেজী এবং অসীম সাহসী এক শিকারী কুকুর।

আসলে বয়স এমনি এক অলংঘনীয় ব্যাপার যে তাকে কোনো ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। বয়স এসে যেমন শৈশব এবং কৈশোরের অসহায়ত্বকে ঠেলে ফেলে দেয় দূরে, তেমনি আবার এই বয়সের কারণে এক সময় মানুষ হয়ে পড়ে চরম অসহায়। তখন শিশু এবং বৃদ্ধের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। যেমন সেদিনের সেই নামকরা বেড়ে এখন উঠোনে প্রবেশ করে অভ্যাসবশত এবং বারান্দার নিচে শুয়ে পড়েনি চার পা একত্রিত করে।

তার চোখে যেন আর কোনো স্বপ্ন নেই। দম ফেলতেও তার এখন কষ্ট হচ্ছে। অথচ এই বেড়ের কারণে পাড়ায় চোর-ডাকাত কোনোদিন ঢুকতে পারেনি।

আফজাল তাকিয়ে আছে বেড়ের দিকে।

বেড়েও তাকিয়ে আছে আফজালের দিকে। বয়সের ভারে সে এখন ক্লান্ত। তবুও তার চোখদুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

আফজালের খুব পরিচিত এই কুকুরটি দীর্ঘদিন যাবত এভাবেই শুয়ে থাকে তার নির্দিষ্ট জায়গায়। শুয়ে থাকবে সারারাত। সকাল হলেই সে উঠে কয়েকটা আড়মোড়া ভেঙ্গে ধীরে ধীরে চলে যাবে। আবার ফিরে আসবে সন্ধ্যায়। আফজালের বারান্দার নিচে। তার নির্দিষ্ট জায়গায়। আগের মতো আর বেড়ে দৌড়ঝাপ করতে পারে না। কারোর পায়ের শব্দে আর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে যেতে পারে না। বয়সের কারণে তার পূর্বের সকল কাজকর্ম থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছে। তবুও অব্যাহতি নেয়নি এই বাড়িটার মায়া থেকে। তার কি যৌবনের কোনো স্মৃতি দোলা দিয়ে যায়? সেকি অস্থির হয়ে ওঠে নিজের ভেতরে? সেকি হাসে কিংবা কাঁদে? একান্ত নির্জনে?

খুব জানতে ইচ্ছা হয় আফজালের। তারও তো এই বয়সটাই কেবল এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছে। তাকে কাঁদিয়ে তুলছে তার পঙ্গুত্ব। তবুও কোনো কোনো সময় তিনি নিজেই আপন হৃদয়ের পৃথিবীতে প্রাণ খুলে বিচরণ করতে পারেন। কখনো বা সেই স্মৃতির এ্যালবামে পেয়ে যান অকল্পনীয় সব ছবির সাক্ষাৎ। মুহূর্তে চমকে ওঠেন আফজাল। ফিরে যান অসীম সমুদ্রের দিকে। যে সমুদ্রকে এক সময় তিনিই তৈরি করেছিলেন। সেই কর্মমুখর যৌবন বয়সে। নিজের খননকৃত সমুদ্রের পাড় বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বিচিত্র সব মুখ

www.pathagar.com

দেখতে পান। দেখতে পান– রাজিয়াও তাকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছে অন্যের হাত ধরে।

রাজিয়া! রাজিয়া এখন কেমন আছে?

পাঁচ বছর আগেও তিনি রাজিয়াকে দেখেছিলেন ঢাকার মৌচাকে। পরনে শাদা শাড়ি। চুলে কলপ করেও তার বার্ধক্য ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাথে দুটো ছেলে–মেয়ে। তাদের বয়সও দশ এবং পনেরো হতে পারে। আফজাল তখনো চাকরি করেন। ভালো চাকরি। রিকসা নেবার জন্যে তিনি চেষ্টা করছেন। হঠাৎ তার একটি অতি পরিচিত ডাক শুনতে পেলেন। ঘাড় ফিরিয়ে আফজাল তাকে চিনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। ততক্ষণে তিনি আরো নিকটে চলে এসেছেন। প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে কি চেনা যাচ্ছে?

আফজাল কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। বললেন, না। আপনার পরিচয়?

আমি? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, আমি রাজিয়া।

–রাজিয়া?

–হ্যাঁ। কেন, আমাকে দেখে চেনার কোনো উপায় নেই?

সত্যিই তাই। তাকে চেনা যাচ্ছে না। কেমন করে যাবে? রাজিয়ার সেই রূপলাবণ্য, সেই যৌবন, সেই বয়স তো আর এখন নেই। এখন সেখানে বাসা বেঁধেছে বার্ধক্য। বার্ধক্যের ছায়াচিহ্ন তার সমগ্র শরীরে। আফজাল একটু হাসলেন। তার হাসির ভেতর কি কোনো বিদ্রুপ ছিল? কোনো তিরস্কার? রাজিয়া তা জানেন না। তিনি বললেন, তোমার কি একটু সময় হবে?

–কেন?

–আমরা একটু কথা বলবো। প্রায় পঁচিশ বছর পর দেখা হলো। আমার কথা বলতে খুব ইচ্ছা করছে। কোথাও একটু বসবে?

আফজাল আবার একটু হাসলেন। বললেন, আমার সময়ের কোনো অভাব নেই। তখনো সময় ছিল, এখনো আছে। তবে হোটেল বা অন্য কোথাও বসার রুচি আমার নেই। তারচেয়ে চলো আমার সাথে। পাশেই আমার বাসা।

–কোথায়?

–মালিবাগে।

রাজিয়া একটু থেমে কিছু যেন ভাবলেন। তারপর বললেন–বাসায়? বাসায় –আর কে কে আছে?

–তুমি গেলেই সেটা দেখতে পাবে।

–এভাবে বাসায় যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

–কেন নয়? মেহমান তো বাসাতেই যায়।

রাজিয়া আবার চুপ থাকলেন। তারপর একটা দম ফেলে বললেন, ঠিক আছে। তাই চলো। আমারও তেমন কোনো তাড়া নেই। রাজিয়া তার সাথের ছেলে–মেয়ে দুটোকে ডেকে কাছে আনলেন। তাদের সাথে আফজালের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এরা আমার নাতী–নাতনী। ছেলেটির নাম রাসেল। আর মেয়েটির নাম–নাসিমা।

www.pathagar.com

–এরা তোমার নাতী–নাতনী?

ওদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আফজাল বললেন, বাহ্ চমৎকার! তুমি খুব সুখী মানুষ রাজিয়া।

রাজিয়া একটি রিকসা ডেকে ওদের তুলে দিয়ে বললেন, তোমরা বাসায় চলে যাও। আমি একটু পরে আসছি।

আফজাল বললেন, ওরা কি যেতে পারবে?

–খুব পারবে। কাছেইতো বাসা। মগবাজারে

রাজিয়ার এই সাফল্যে আফজাল খুব খুশি হলেন । ভাবলেন, যাক! আর যাই হোক রাজিয়া অন্তত ভালো আছে। সংসার নাতী–নাতনী নিয়ে খুব সুখেই আছে।

বাসায় পৌঁছে আফজাল বললেন, বসো রাজিয়া, আমি একটু ভেতর থেকে আসি।

রাজিয়া বসে আছেন।

একটু পরে ফিরে এলেন আফজাল। রাজিয়া জিজ্ঞেস করলেন, বাসায় কি আর কেউ নেই?

–হ্যাঁ আছে।

–কে?

–রোকেয়া। কিন্তু সে এখনও স্কুল থেকে আসেনি।

–রোকেয়া? তোমার মেয়ে বুঝি?

–হ্যাঁ।

–ওর মা কোথায়?

–নেই।

–নেই মানে?

–দু' বছর আগে মারা গেছে।

–বলো কি? তাহলে কিভাবে তোমার সংসার চলছে।

এই চলে যাচ্ছে একভাবে আর কি। থাক এসব কথা। এবার তোমার খবর বলো।

–কি বলবো?

–তোমার স্বামী সংসার আর নাতী–পুতীদের খবর বলো।

রাজিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সে অনেক কথা আফজাল। তোমাকে সেসব বলা কি আর ঠিক হবে?

–কেন নয়? তবু যদি আপত্তি থাকে তবে বলো না। জানো, মানুষের এমন কিছু ব্যক্তিগত কথা থাকে যা কেবল তার নিজের জন্য। অন্য কেউ সেই গোপন দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশের অধিকার রাখে না।

রাজিয়া বললেন, না তেমন কিছু গোপনীয় নয়।

–তবে?

–তবে কিছুই নয়। তাহলে শোনো, আমার জীবনেও গত পঁচিশটি বছরে ঘটে গেছে একে একে বহু দুর্ঘটনা।

–দুর্ঘটনা?

–হ্যাঁ। প্রথমে আমার স্বামী অসুখে মারা গেল। তারপর গত পাঁচ বছর আগে আমার একমাত্র ছেলে রাইসুল ইউনিভার্সিটির গোলযোগে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। কেন পেপারে

www.pathagar.com

দেখোনি?

রাজিয়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। আফজাল বললেন, বলো কি? তাহলে ঐ যে বললে তোমার নাতী–নাতনী

–ওরা আমার কেউ নয়। আমার বাসায় ভাড়া থাকে। ওদেরকে আগলে আমার দুঃখভার সময়টা কাটাই আর কি!

আফজাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, খুবই মর্মান্তিক খবর শোনালে রাজিয়া। আমি ভেবেছিলাম তুমি বেশ সুখেই আছো।

–আমিওতো তোমার সম্পর্কে তাই ভাবতাম। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম তোমার ভালো থাকার বাস্তব অবস্থা। আচ্ছা বলতো, এমনটি কেন হয়?

–কেমন?

–এই যেমন ধরো আমরা যা ভাবি হয়ে যায় ঠিক তার উল্টোটি।

–এই ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর তো আমাদের কোন হাত নেই রাজিয়া। বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর উপায় কি বলো? বুঝলে, মানুষ প্রকৃত অর্থে বড়ো অসহায়। এই বয়সে এসে আমি এটা বুঝেছি।

রাজিয়া বললেন, এটাকে আমরা কি আর পরিবর্তন করতে পারিনে?

–কি ভাবে?

রাজিয়া একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, আমারও খুব ভয় করছে আফজাল। এই বয়সটাই তার মূল কারণ। ভাবছি, এখনো তো কিছুটা চলতে ফিরতে পারি। কিন্তু তারপর?

–তারপর আবার কি? ঢাকা শহরে বাড়ির মালিক। তোমার আর কিসের ভয়? আফজাল বললেন।

–ওটা তুমি বুঝবেনা আফজাল। চুল পেকে গেছে আমার। বয়সও পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। এই বয়সে এসে মনে হচ্ছে–আমি বড্ডো একা। বড্ডো অসহায়। আমার একটি অবলম্বনের প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারো?

–আমি ? কিভাবে?

রাজিয়ার দৃষ্টি এবার নিচের দিকে নেমে গেল।। বললো, যদি কিছু মনে না করো তাহলে বলি। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার বাসায় নির্দ্বিধায় উঠে আসতে পারো এবং সেটা হলে আমি খুব খুশি হবো।

–কি ভাড়াটে হিসেবে?

–না।

–তবে?

–আমাদের বয়স হলেও আমরা মানুষ। আর মানুষের অধিকার আছে যে কোনো বয়সে একে অপরের অসহায়ত্ব এবং অনিশ্চয়তায় একাকীত্ব থেকে মুক্তির জন্যে বৈধভাবে বসবাস করার। আমরা এখনো সেটা করতে পারি। অসুবিধা কোথায়?

আফজাল এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বলো কি রাজিয়া? এটা এখন কেমন করে সম্ভব?

–কেন নয়? একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখোতো! তোমার বয়স হয়েছে। তবুও চাকরি করছো। সম্ভবত আর বেশীদিন চাকরি করতে পারবে না। একদিন মেয়েটিকেও বিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে হবে। তখন তুমি কি করবে? অবলম্বন হিসেবে কাকে তুমি কাছে পাবে? মানুষতো আর একাকী বাঁচতে পারে না। কোনো মানুষই তো স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে? আর জানো তো, শেষ বয়সে একমাত্র স্বামী-স্ত্রীই হয়ে ওঠে একান্ত আপন, একান্ত বান্ধব।

আফজাল আবারও নীরব।

রাজিয়া বললেন, ঠিক আছে। এখনই কিছু বলতে হবে না। ভালো করে ভেবে তারপর আমাকে জানাবে। তুমি হয়তো বা সামাজিক লজ্জা বা ভয়ের কথা বলবে, কিন্তু ওটা কিছু নয়। যা কিছু অবৈধ তাই অসামাজিক। আমাদের কঠিন মুহূর্তের জন্যে এই সমাজের কেউ কোনোদিন এগিয়ে আসবে না। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদেরকেই নিতে হবে।

আফজাল এবার নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, তা আর হয়না রাজিয়া। যেটা হবার নয় তা নিয়ে অনর্থক ভেবে লাভ কি বলো?

রাজিয়া বললেন, তোমার কথা ভেবেও কি আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারো না?

ক্ষমার কথা নয় রাজিয়া। তোমাকে আগে যেমন দেখতাম। আজো তেমনি দেখছি। আমার কাছে তুমি বাকীটা জীবন এমনি থাকবে।

-চাকরি ছাড়ার পর তাহলে কোথায় যাবে, কি করবে?

-আমি ভেবেছি চাকরি ছাড়ার পর গ্রামে চলে যাবো। আমার একটি বিধবা বোন আছে। তাকে বাড়িতে এনে তার হাতে রোকেয়াকে তুলে দেব। আর আমি? আমাকে নিয়ে কিছুই ভাবছিনে রাজিয়া।

-এটা তোমার অভিমানের কথা।

-হতে পারে।

-তবুও একবার ভেবে দেখো আফজাল। আমিও খুব অসুস্থ। আমার একটা কিডনী নষ্ট। ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিকসহ নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। জানিনা এভাবে আর কয়দিনই বা বেঁচে থাকতে পারবো। তোমার সংস্পর্শে এলে হয়তোবা আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারতাম। আমাকে জীবিত দেখতে, ভালো দেখতে, সুখী দেখতে তোমার কি একটুও ইচ্ছে হয় না?

রাজিয়ার এই কথার কোনো জবাব দিলেন না আফজাল। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন, তুমি একটু বসো। আমি চা করে আনি। কাজের মেয়েটি রোকেয়াকে স্কুল থেকে আনতে গেছে।

রাজিয়া উঠতে উঠতে বললেন, না থাক। চায়ের প্রয়োজন নেই। আমি চলে যাচ্ছি। তবে তুমি আর একবার ভেবে দেখবে। আমি আবার আসবো।

বাধা দিলেন না আফজাল। রাজিয়া চলে যাবার পর আফজালের বুকটা ব্যথায় ভরে গেল। ভাবলেন, তার সাথে দেখা না হলেই ভালো হতো। দেখা না হলে অন্তত তিনি এই সান্ত্বনা নিয়ে থাকতে পারতেন যে রাজিয়া ভালো আছে।

আফজালও কি ভালো আছেন? কতটা ভালো আছেন? রাজিয়ার সাথে দেখা হবার সপ্তাহখানেক পরেই তিনি এক্সিডেন্ট করে একটি পা হারালেন। তারপর চাকরি হারিয়ে ফিরে এলেন গ্রামে। বিধবা বোন লতিফাকে এনে রোকেয়ার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তুলে দিলেন

www.pathagar.com

তার হাতে এবং তারপর।—

তারপর প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি একেবারেই অচল হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। পাঁচ বছর আগে দেখা হয়েছিল অসুস্থ রাজিয়ার সাথে। রাজিয়া এখন কেমন আছে? আদৌ কি সে বেঁচে আছে?

জানেন না আফজাল। তিনি কেবল অসহায়ভাবে শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে।

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে গ্রাস করে নিয়েছে পুরো গ্রাম। সমগ্র পৃথিবীকে। আজ কি অমাবস্যা? আজ কি আকাশে মেঘ জমেছে? আফজালের ভীষণ জানতে ইচ্ছে হয়। বারান্দার নিচে শুয়ে আছে বয়সী কুকুরটি। বেড়ে। গত সপ্তাহে তার সঙ্গীটি মারা গেছে। সে মারা যাবার পর থেকে বেড়ে আরো নীরব হয়ে গেছে। হয়তোবা সেও ভুলতে পারছেনা সঙ্গী হারাবার শোক। বৃদ্ধ হলেও সে একটি জীব। তারও প্রাণ আছে। আর প্রাণ আছে বলেই তার ভেতরও আছে অনিঃশেষ প্রেম এবং ভালোবাসা। বেড়ে কি ঘুমুচ্ছে? তার চোখ দুটো আর তো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছে না? নাকি আফজালই তার কুকুরটিকে দেখতে পাচ্ছে না? একটা পাথরের চাঙ যেন ক্রমশ আফজালের বুকের গভীর থেকে উঠে গলার কাছে এসে আটকে গেল।

ভারী পাথরটির নাম—বেদনা।

গলার মুখ থেকে পাথরটিকে কয়েকবার তুলতে চেষ্টা করলেন আফজাল। ব্যর্থ হলেন। তার জীর্ণশীর্ণ পঙ্গু শরীরটাই এক সময় তলিয়ে গেল স্মৃতির সমুদ্রে। আর তিনি সেই অথৈ সাগরে কেবলই অসহায় শিশুর মতো পাক খেতে লাগলেন। এই ঘূর্ণেয়মান প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি অনুভব করলেন–রাজিয়ার মায়াময়ী নির্ভরযোগ্য অস্তিত্ব। ভাবলেন, ভালোবাসা কিংবা প্রেমের জন্যে আসলে বয়সটা কোনো ফ্যাক্টর নয়। মানুষের বয়স থাকে। প্রেমের থাকে না। বরং বয়সের ক্রান্তি সময়ে এসে মানুষের জন্যে সেটির আরো বেশী করে প্রয়োজন হয়। তা না হলে জীবনটা হয়ে ওঠে বিষাদময়। হয়ে ওঠে একাকীত্ব এবং অসহায়ত্বের কালো পর্বতের মতো বিশাল ভারী।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই আফজালের ক্লিষ্ট চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো এবং তারপর।—

তারপর আফজাল অনুভব করলেন কঙ্কালসার দেহটা নিয়ে তার বয়স এবং কাল যেন একবার শূন্যে তুলে আছাড় মারছে। আবার পরক্ষণেই অসীম সমুদ্রে তাকে ফেলে দিয়ে তারা কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতুকভরে দেখছে–অসহায় আফজালের ডুব—সাঁতারের নির্মম–নিষ্ঠুর খেলা।

ক্লান্তিতে ঘন–আরো ঘন হয়ে আসে তার নিঃশ্বাস। তিনি অনিশ্চিত এই যন্ত্রণাকাতর প্রহর থেকে মুক্তি পেতে চান। ছুঁতে চান একটি নির্ভরতার পাড়। কিনারে উঠতে চান। কিন্তু কিভাবে?

তা জানেন না আফজালুর রহমান। ■

www.pathagar.com

ডুবসাঁতার

মোশাররফ হোসেন খান